আব্দুল মান্নান খান

১৯৭১ এক সাধারণ লোকের কাহিনী

একাত্তরকে নিয়ে এযাবত যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশই যুদ্ধের কুশীলব, নয়তো মসিজীবী। কিন্তু এই বইয়ের লেখক এসবের কোনটাই নন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সকল অর্থেই একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী।

বাংলাদেশে এঁদের মত মানুষ মঞ্চে ওঠেন না কিন্তু মিটিংয়ে-মিছিলে থাকেন, একশ' চুয়াল্লিশ ধারা-কারফিউ ভাঙেন। বেঁচে থাকা এঁদের নিয়তি, মৃত্যু এসে এঁদের মহীয়ান করলেও করতে পারত। এঁরা ধ্বংস ও সৃষ্টির কারিগর, উপাদান তো বটেই। সবার মত এঁরাও একাত্তরের উত্তাপে তপ্ত হয়েছেন, বিজয়ে হয়েছেন উদ্বেলিত, মুক্তিতে পেয়েছেন অনির্বচনীয় আনন্দ।

একাত্তরে তাঁদের কেমন কেটেছিল, একাত্তরে তাঁরা কি করেছিলেন, এদেশে একাত্তর সৃষ্টি হবার পেছনেই বা তাঁদের কি ভূমিকা ছিল— এসব বিষয় তাই ইতিহাসের আবশ্যকীয় উপাদান।

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

টাকা ১৯০.০০

এই প্রেক্ষাপটে আমরা এই রচনাটিকে একটি 'কেস স্টাডি' হিসাবে গ্রহণ করেছি। দেশের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এরকম মানুষদের জবানী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আরও প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ করবে, এ আশা নিয়ে বইটি প্রকাশ করা হয়েছে।

আব্দুল মান্নান খান (জ. ১৯৪৯)-এর জন্ম যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানার অন্তর্গত পাঠান পাইকপাড়া গ্রামে। ঝিনাইদহ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকায় আসেন ও ১৯৭২ সালে ঢাকার মতিঝিল টিএন্ডটি নাইট কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেন।

১৯৭৩ সালে তৎকালীন এজিবি (সিভিল) অফিসে তিনি অডিটর পদে যোগদান করেন। পরে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন জনশিক্ষা পরিচালকের অধীনে সহকারী হিসাব রক্ষণ অফিসার পদে যোগ দেন। বর্তমানে ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারী শিক্ষা অফিসার হিসাবে কর্মরত।

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫৬৫৪৪১, ৯৫৬৫৪৪৩, ৯৫৬৫৪৪৪
মোবাইল: ০১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com.bd

প্রথম প্রকাশ ২০০০
পুনর্মুদ্রণ ২০১৪

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

ISBN 978 984 506 182 7

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। এএমএস এন্টারপ্রাইজ, ২৬২/ক ফকিরাপুল, ঢাকা-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

UNISHSHA EKATTOR: EK SADHARAN LOKER KAHINI (Story of a common man about 1971) by Abdul Mannan Khan, published in January 2000 by The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C/A, Dhaka, Bangladesh.

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বাল্যবন্ধু
সফিউদ্দিন সুফি'র
স্মৃতির উদ্দেশে

মুখবন্ধ

আমি সত্যিকার অর্থেই একজন সাধারণ মানুষ। অজ পাড়াগাঁয়ে জন্ম, মফস্বলের স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া। কিন্তু যে সময়টায় আমি কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, সেটা ছিল বাংলাদেশের একটা বিশেষ সময়। বাঙালীর স্বাধিকারের ধারণা তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। মিছিল, মিটিং, একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধিকারের প্রশ্নে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় আক্রান্ত হয়েছে সারাদেশ। এমনকি স্কুলের ছাত্ররাও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। মনঃসংযোগ দিয়ে লেখা-পড়া হয়নি, মিছিলে মিটিংয়ে জড়িয়ে গেছি স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই প্রথমে মফস্বলে, পরে ঢাকা শহরে। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার মত আরও শত সহস্র কিশোর-যুবক এভাবেই জনতার মিছিলে সামিল হয়েছে, তাদের অনেকেই আম-জনতা থেকে আর আলাদা বৈশিষ্ট্যে বা ব্যক্তিত্বে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেনি।

আমি সেই আম-জনতার একজন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, কাকতালীয়ভাবেই, কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার। তা না হলে ঢাকায় আসাদ যে মিছিলে গুলি খেয়েছিল সে মিছিলে আমি থাকব কেন? আবার উনসত্তরের গণআন্দোলনে শান্তিনগর এলাকায় কার্ফিউ ভঙ্গ করার মিছিলেও আমি ছিলাম। একাত্তরের পঁচিশে মার্চে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে যখন আবাল বনিতা হাজার হাজার শরণার্থী দেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় গ্রহণের জন্য যায়, আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছিলাম।

প্রচলিত অর্থে আমি মুক্তিযোদ্ধা নই। কোন মুক্তিযোদ্ধা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথাগত ট্রেনিং নিয়ে কোন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি। আবার স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছি সারা নয় মাস। নানান জিনিস নানান ঘটনা প্রত্যক্ষও করেছি, কখনো বা নিজের জীবনকে বিপন্নও করে তুলেছি।

আমার সেই সব টুকরো টুকরো স্মৃতির কি বা মূল্য থাকতে পারে? কিন্তু ১৯৯৬ সালে বর্ষব্যাপী স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে যখন দেশের প্রায় সব পত্রিকার পাতা জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী প্রকাশিত হয়ে থাকে, তখন আমার ভেতরের স্মৃতিগুলো আমাকে খুবই বিপর্যস্ত করে তোলে। কিছু লেখার ইচ্ছা মনের মধ্যে চাগিয়ে ওঠে। কখনো কোথাও লিখিনি, তবু সাহস করে আমার কিছু বক্তব্য লিখে একদিন পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিই। 'স্বীকৃতি চায়' শিরোনামে আমার সে লেখাটি ২৮ ডিসেম্বর, '৯৬ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে ছাপা হয়। লেখাটি পত্রিকায় এসেছে দেখে আমার বেশ ভাল লাগে। বলা যায় সেখান থেকে শুরু আমার এই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা রচনার। তাই দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার কাছে আমি ঋণী।

এমনি আরও একবার সাহস করে, বলতে গেলে দুরু দুরু বুকে, একদিন ইউপিএল-এ এলাম, যদি তাঁরা আমার এই রচনাটি প্রকাশ করেন, এরকম একটা আশা নিয়ে। আমি আশ্চর্য হলাম তাঁদের সহানুভূতি দেখে। এঁদের উপদেষ্টা-সম্পাদক জনাব বদিউদ্দিন নাজির আমাকে আশ্বস্ত করলেন, লেখা পড়লেন, আলোচনা করলেন, কোথাও কোথাও পাণ্ডুলিপি ছাঁটলেন, কোথাও নতুন করে কিছু লিখতে বললেন, তথ্য যাচাই-বাছাই করলেন, বইয়ের নতুন নামকরণও করলেন। আমি তাঁর প্রতিটি পরামর্শ হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি।

এই বইটিতে একাত্তর সালের উত্তাল দিনে আমি যা দেখেছি, এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা সত্য মনে হয়েছে তাই প্রকাশ করেছি। প্রাসঙ্গিক মনে করে কোথাও কোথাও একাত্তরের আগে ও পরে গিয়েছি। আমার আনাড়ি হাতের কারণে তবু এই লেখায় দোষ-ত্রুটি, অপ্রাসঙ্গিকতা, খাপছাড়া ভাব ইত্যাদি অবশ্যই রয়েছে। আমি এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যদি এই লেখা মহান মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা ক্ষণিকের জন্যে হলেও কাউকে ভাবতে সাহায্য করে, সেটাই হবে আমার সার্থকতা। সেই সঙ্গে এই বই আমার মত আরও অনেককে ঐ দিনগুলোর স্মৃতি চারণ করতে উস্‌কে দিলে বহু বর্ণে, তত্ত্বে ও তথ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পরিধি বাড়বে।

এই লেখার কাজে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের কাছে ঋণী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আমার বড় বোনতুল্য মিসেস কামরুন নেছা, বোন সেলিনা রশিদ, কন্যাতুল্য সাথী, আমার স্ত্রী সেলিমা খাতুন (বোড়ন) এবং আমার একমাত্র আদরের মামণি কাবেরী যাদের উৎসাহ আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে ধন্যবাদ দিই প্রকাশক মহোদয়কে যাঁর সহানুভূতি না পেলে হয়তো কোনোদিনই আমার এই লেখা আলোর মুখ দেখত না।

ঢাকা, ২০০০ আবদুল মান্নান খান

১৯৬৯ সলের জানুয়ারী মাসের ২০ তারিখ। দুপুর বেলা। কার্জন হলের সামনে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। মিছিল আসছে। মিছিলের শ্লোগান শোনা যাচ্ছে: বাঁচার মত বাঁচতে চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। এখনকার দোয়েল চত্বর হয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছি। এদিক দিয়ে আরও অনেকে এসে যোগ দিয়েছে। মিছিল এগিয়ে চলেছে পুরাতন কলা ভবনের দিকে। তখন এই এলাকায় এতো প্রাচীর ছিলো না। মাঠটি ছিলো ফাঁকা। ফলে ছাত্রদের জন্য সুবিধা ছিলো। ছাত্র পুলিশে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। একদিকে ইট পাটকেল অন্যদিকে লাঠি চার্জ আর কাঁদনে গ্যাস। মাঠের কোণায় সেই তালগাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মিছিলের একটা অংশ ঐ দিক থেকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

মিছিলে গুলি হতে পারে এমন ধারণা তখনো করা যায়নি। রশিদ বিল্ডিং-এর সামনে দেখা গেলো পুলিশের একটি জীপ। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি এবং তার পর পরই গুলি। খুব কাছে থেকে রিভলবার উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়লো জনৈক পুলিশ অফিসার এক ছাত্রের বুকে।

রাস্তার ওপরেই ঢলে পড়লো ছাত্রটি, রক্তাক্ত দেহ ধরাধরি করে হাসপাতালে নেয়ার পথে বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের ইমারজেন্সি গেট পর্যন্ত যেতে না যেতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নির্ভীক ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান, আমাদের অতি পরিচিত আসাদ ভাই।

আসাদের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো সমস্ত ছাত্র সমাজ। সঙ্গে যোগ দিলো সর্বস্তরের মানুষ। দিকে দিকে শ্লোগান উঠলো, আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

জীবন দিয়ে উনসত্তরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করে দিয়ে গেলো আসাদ। জীবন দিয়ে বাঙ্গালী জাতির স্বাধিকার আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাকেই চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেলো আসাদ।

মিটিং মিছিল বিক্ষোভ সার্বক্ষণিক রূপ নিলো। ছাত্র জনতা আর কোন বাধা মানে না। লাঠি চার্জ কাঁদুনে গ্যাস উপেক্ষা করে এগিয়ে চললো জনতার মিছিল। সচিবালয়ের পশ্চিম গা ঘেঁষে তোপখানা রোড আর আব্দুল গনি রোডের মধ্যে এখন যে প্রশস্ত সংযোগ সড়কটি দেখা যায় তখন ঐখান দিয়ে গভীর একটা কাঁচা ড্রেন ছিলো যার পূর্ব পাশ দিয়ে ছিলো ছোট ছোট হোটেল, দর্জির দোকান, চুল কাটার সেলুন ইত্যাদি। ঐ সমস্ত দোকানের কর্মচারী বয়-বেয়ারা সবাই ছিলো মিছিলের সহায়ক শক্তি। কাঁদুনে গ্যাসের ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় যখন মিছিলে টেকা যাচ্ছে না তখন দেখেছি বালতি কলসি ভরে পানি এনে তারা মিছিলে দিয়েছে। পানি দিয়ে চোখের জ্বালা কমাতে চেষ্টা করেছে তবু মিছিল ছাড়েনি কেউ। মনে হয় এই যেন সেদিন বালতির পানিতে রুমালখানা ভিজিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের ২৪ তারিখ। মিছিল এগিয়ে চলেছে। প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিলে গুলি হলো। কালের সাক্ষী প্রেস ক্লাব। ফিনকি দিয়ে ছুটলো মতিউরের বুকের রক্ত। রাজপথে ঢলে পড়লো নবকুমার ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের রক্তাক্ত কচি দেহ। কাছে এগিয়ে গেলাম। কেউ সরে গেলো না, বরং দলে দলে ছাত্র জনতা এসে যোগ দিলো মিছিলে। ঢলের মতো মানুষ নেমে এলো রাস্তায়। লাশ নিয়ে যাওয়া হলো তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে, বর্তমানে যে হলের নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, সেখানে। প্রস্তুতি চলছে লাশ নিয়ে মিছিল বের করার। ছাত্র নেতারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। চলছে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা। মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে শ্লোগান: শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।

এমন সময় উপস্থিত হলেন মতিউরের বাবা জনাব আজহার আলী মল্লিক। ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো চারদিক। তিনি দাঁড়ালেন, সামনে ছেলের লাশ। হাজার হাজার ছাত্র জনতার দিকে তাকালেন, বললেন, এক মতিউরকে হারিয়ে আজ হাজার মতিউর পেয়েছি, এক মতিউরের পরিবর্তে হাজার মতিউর আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য, কানে ভেসে আসে সেই অসাধারণ কথাগুলো। কত বড় মনোবল থাকলে আর কতখানি দেশপ্রেম থাকলে একজন মানুষ এমনভাবে কথা বলতে পারেন! তিনি একজন অসাধারণ মানুষ, ইতিহাসে তাঁর ঠাঁই। তিনি আমাদের উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উজ্জ্বল তারকা শহীদ মতিউরের বাবা।

২

কার্ফিউ আর কার্ফিউ, দিনে রাতে কার্ফিউ। কখনো দিনে শিথিল হলো তো রাতে কার্ফিউ। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। কার্ফিউ ভঙ্গের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো সারা ঢাকা

শহরে। মিলিটারী টহল। দেখা মাত্র গুলির হুকুম দিলো সরকার, কিন্তু গুলিকে আর পরোয়া করে না বাঙ্গালী। খণ্ড খণ্ডভাবে মহল্লায় মহল্লায় কার্ফিউ ব্রেক করতে হবে। এ নির্দেশ কে দিয়েছে কখন দিয়েছে কিভাবে করতে হবে তা কারো জানার প্রয়োজন নেই। তাগিদ সকলের অন্তরে। মুক্তিপাগল মানুষ জেগেছে। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার আলোর আভাস পেয়েছে।

শান্তিনগর বাজারের দক্ষিণে ১নং যে বাড়িটি তার নাম শচীবাস। এককালের জমিদার বাড়ি। দোতলা বিল্ডিংসহ আছে পুকুর। আছে শান বাঁধানো ঘাট। বাড়ির পশ্চিম দিকে রাস্তার ধারে সারি সারি ঘর। ফরিদপুর জেলার ডুমাইন ইউনিয়নের ডুমাইন গ্রামের একটি পরিবার এখানে বসবাস করে। বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একটি পৃথক পরিবার বসবাস করেন সেটা সেমিপাকা ঘর।

পশ্চিম দিকে যে সারি সারি ঘরের কথা বললাম সেগুলো মেস। এই মেসে চাকরীজীবী ব্যবসায়ী ছাত্র সব ধরনের লোক থাকেন। তাছাড়া বাড়ির সীমানার মধ্যে অনেকখানি খালি জায়গা আছে। আছে বিভিন্ন রকম ফলের গাছ। এই বাড়ির ছেলেরা মেসের ছেলেরা শান্তিনগর বাজার এলাকার ছেলেরা সব মিলে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করি। এখানে আমার নিয়মিত যাতায়াত আছে সে কথা একটু পরে বলছি। এখানে আমরা যে জায়গাটুকুর মধ্যে কাজ করি তা হলো শান্তিনগর ৪ রাস্তার মোড় থেকে কাকরাইল মোড় এবং কাকরাইল মোড় থেকে জোনাকি সিনেমা হলের আগ পর্যন্ত। কার্ফিউ ভঙ্গ করার জন্য আমরা বেশ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করি। চারটি ছোট ছোট দলে আমরা ভাগ হয়ে যাই। প্রথম দল শান্তিনগর বাজারের কাছে জাপান কনসুলেট (এখন নেই) অফিসের সামনে থাকবে। সেখান থেকে তারা কাকরাইলের দিকে যাবে। দুটো দল কাকরাইলের মোড়ে থাকবে। সেখান থেকে একটি দল শান্তিনগর বাজারের দিকে এগিয়ে আসবে আর একটি দল জোনাকি সিনেমা হলের দিকে এগিয়ে যাবে। জোনাকি সিনেমা হলের পশ্চিমে যে দলটি থাকবে তারা কাকরাইলের দিকে এগিয়ে আসবে।

চার গ্রুপের ৪ জন দলনেতা ঠিক করা হলো। প্রথম গ্রুপ শান্তিনগর বাজার, দলনেতা পিরু,ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রুপ কাকরাইল, দলনেতা আবুল হোসেন আর মফিজার, চতুর্থ গ্রুপে দলনেতা কুদ্দুস। সিদ্ধান্ত হলো একই সাথে শ্লোগান দিয়ে বোমা ফাটিয়ে দৌড় পায়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবে মিলিটারী টহলের সামনে কোন অবস্থায় পড়া যাবে না। প্রয়োজনে লুকিয়ে যেতে হবে। আবার টহল সরে গেলে রাস্তায় নামতে হবে। কাকরাইলের একটা গ্রুপ শান্তিনগর গ্রুপের সাথে মাঝামাঝি মিলিত হবে এবং আর একটা গ্রুপ জোনাকি হলের গ্রুপের সাথে কফিল হোটেলের (এখন নেই, তবে অশ্বত্থ গাছটা আছে) কাছে মিলিত হবে। এক সাথে চারটা বোমা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়ে যখন রাস্তায় নেমে পড়া হলো তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মিলিটারী গাড়ি এসে গেলো। পরিকল্পনা মাফিক আমরা মুহূর্তে আত্মগোপন করে ফেলি। আজকে যেখানে স্কাউট ভবন সেখানে ছিলো খালি জায়গা। মাঝে মাঝে ইটের স্তূপ, আলোআঁধারিতে আমরা কয়েকজন ঐ ইটের

স্তূপের আড়ালে চলে যাই। শাঁ শাঁ করে মেশিন গানের গুলি চলে গেলো পাশ দিয়ে। থেমে থেমে চারবারে আমরা আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর করি এবং শান্তিনগর এলাকার কার্ফিউ ভঙ্গ করি। এভাবেই উনসত্তর সালের ৩১শে জানুয়ারী সারা ঢাকা শহরের মানুষ কার্ফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে ফেলে এবং সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ নস্যাৎ করে দেয়।

সেদিনের সাথীরা অনেকে আজ বেঁচে নেই। একেবারে সম্মুখ সমরে পাকিস্তান বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ফরিদপুর জেলার ডুমাইন ইউনিয়নের মফিজ্জার, নিহত হয় খলিল। আবুল হোসেন বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের একজন কর্মকর্তা। পিরু উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছিলো রাজনীতি করে। কুদ্দুস একজন ব্যাংকার। উজ্জ্বল কানাডায় আছে, নামকরা ডাক্তার। শেলী, রইস, রহমান, রহমত, নাম মনে না থাকা আরো অনেক সাথী স্মৃতির পাতায় আজও জেগে আছে।

৩

বাহান্নর গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আসে উনসত্তরের ফেব্রুয়ারী। ১৫ তারিখে হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হককে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন তিনি। কুর্মিটোলা সেনাছাউনিতে বন্দী থাকা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয় তাঁকে। পরের দিন তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। লাখো মানুষ জানাযা শেষে অংশগ্রহণ করে শোক মিছিলে। সে মিছিল যায় পল্টন থেকে আজিমপুর কবর স্থান পর্যন্ত।

১৮ তারিখে শহীদ হলেন ড. শামসুজ্জোহা। তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটেই তিনি সামরিক বাহিনীর গুলিতে শাহাদত বরণ করেন।

আসে একুশে ফেব্রুয়ারী। উনসত্তরের একুশ বাঙ্গালী গণমানুষের ঐক্যের একুশ। সেই একুশে ফেব্রুয়ারীতে মানুষ কিভাবে জেগে উঠেছিলো সে বর্ণনা তুলে ধরার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটুকু শুধু বলতে পারি যে, সেদিন উপলব্ধি করা গিয়েছিলো জাগরণ কাকে বলে, এর উৎস কোথায় এবং এর ধারা কি। ঢাকা শহরের এমন কোন মহল্লা অলিগলি ছিলো না যেখান থেকে সেদিন প্রভাতফেরী শহীদ মিনারে আসেনি। এতো নগ্নপদ যাত্রা, এতো শুভ্র বসনা, জীবনের এতো স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার আর কখনো দেখিনি। সন্ধ্যা থেকে

অপেক্ষা কখন রওনা হবে প্রভাত ফেরি। কখন বাজবে রাত ১২ টা ১ মিনিট। শুরু হবে ২১ শে ফেব্রুয়ারী।

শান্তিনগর বাজার এলাকার ছেলেরা মিলে ঠিক করা হলো রাত ১০ টার দিকেই আমরা নিউ মার্কেট এলাকায় পৌঁছে যাবো এবং আজিমপুর কবরস্থান হয়ে শহীদ মিনারে পৌঁছাবো। আমরা শান্তিনগর থেকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে নগ্ন পায়ে রওনা হয়ে যাই। তখন কে ছাত্র, কে দোকান কর্মচারী, কে বাসার কাজের ছেলে-এ ভেদাভেদ ঐ দিন অন্তত ছিলো না। আমাদের প্রভাত ফেরি নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে পৌঁছে। সেখানে ভাষা সৈনিকদের কবরের পাশে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে নীরবে পুষ্প অর্পণ করে ভোর ভোর আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছে যাই। শহীদ মিনার। এ যেন সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয়নিংড়ানো শ্রদ্ধার এক জাগ্রত প্রতীক।

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি?'

এই মূলমন্ত্র সকলের কণ্ঠে। সর্বত্র। এ সুরের আবহে আমরা সকলেই হয়ে যাই শিল্পী।

অনেক বেলা অবধি আমরা ঐ চত্বর ছেড়ে আসতে পারিনি। একটি খোলা জিপে মুভি ক্যামেরা হাতে অবিরাম কাজ করে চলেছেন জহির রায়হান। সারা রাত তাঁকে দেখা গেছে। শোনা গিয়েছিলো রাজ্জাক, সুচন্দা একটি প্রভাত ফেরির পুরোভাগে থেকে ব্যানার হাতে শহীদ মিনারে আসবেন এবং সেটায় সুটিং হয়ে যাবে। শেষ অবধি জনতার ভিড়ে তা আর সম্ভব হয়নি। তবে কাজ যা করার জহির রায়হান তা করে ফেলেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি "জীবন থেকে নেয়া" ছায়াছবিতে, যা একটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র এবং একটি সম্পূর্ণ মুক্তির সংগ্রাম। প্রতি বছর একুশ আসে আর স্মৃতিতে নাড়া দিয়ে যায় সেই উনসত্তরের একুশ।

উনসত্তরের একুশ শক্ত করে দিলো চরম আন্দোলনের ভিত। আর কখনো আমাদের পেছনে ফিরতে হয়নি। মিটিং মিছিল বিক্ষোভে টগবগ করে উঠেছে ঢাকা চট্টগ্রামসহ সারা দেশের শহর বন্দর।

পরের দিনই ২২ ফেব্রুয়ারী মুক্তি পেলেন শেখ মুজিব। মানুষ দৌঁড়াচ্ছে। সে দৌঁড়ের কোন নির্দিষ্ট রাস্তা নেই, দৌঁড়াচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে। খবর হলো, শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। সাথে সাথে যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থায় দৌঁড় শুরু করেছে। রাস্তা ঘুরে যাবার মতো সময় কারো নেই। সবকিছু উপেক্ষা করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে মানুষ শেখ মুজিবকে বরণ করে আনবে বলে। ফুল নেই ঢাকা শহরে। গতকালই শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়নি হৃদয়ের ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা বুকে নিয়ে ছুটেছে মানুষ তাদের নেতাকে এক নজর দেখবে বলে। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। যাঁরা সে দৃশ্য দেখেছেন তাঁদের শুধু আমি মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। তবে স্পষ্টত মনে আছে, আমি তখন বিজয় নগর রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি দেখি দলে দলে লোক উত্তর দিকে দৌঁড়াচ্ছে। শেখ মুজিব

মুক্তি পেয়েছেন, আর কিছু জানার দরকার নেই। এখন কোথায় আছেন, দেখা হবে কি হবে না, এতোসব জানার কোন প্রয়োজন কেউ মনে করেনি। কেবল ছুটেছে মানুষ অন্তরে ভালোবাসা নিয়ে। সেই ভালোবাসার কাছেই উড়ে গেছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবকে গণসম্বর্ধনা দেয়া হলো। রেসকোর্স ময়দানে ঢাকার ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। লক্ষ লক্ষ লোক সেই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হলো। সেই সভার সভামঞ্চ তৈরি হয়েছিলো রেসকোর্স ময়দানের যেখানটায় বট-অশ্বত্থ জড়াজড়ি করে কালের সাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে তার কোল ঘেঁষে। বর্তমানে শিশুপার্কের ভেতরে গেলে দেখা যায় ঐতিহাসিক সেই স্থানটি যেখানে কতকগুলো খাবারের দোকান দিয়ে বসে আছে কিছু লোক। এখন কেউ বলতে পারে না একদিন এখানে কি ঘটেছিলো।

এই মাঠে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভার মঞ্চ দেখেছি। ১০ জানুয়ারী '৭২ বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার জনসভার মঞ্চ দেখেছি। ইন্দিরা মঞ্চ দেখে সেদিনের সেই ২৩ ফেব্রুয়ারীর সম্বর্ধনা সভার স্থানে তেমন করে আর কোন মঞ্চ তৈরি হতে দেখিনি। বটঅশ্বত্থের গোড়ায় যেন প্রকৃতির কোলের কাছে তৈরি করা হয়েছিলো সেই মঞ্চ।

সেই ঐতিহাসিক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব তোফায়েল আহম্মদ। সেই সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তোফায়েল আহমদ যখন এই প্রস্তাব করেন উপস্থিত ছাত্রজনতা প্রাণ খুলে দুই হাত তুলে সেই প্রস্তাব সমর্থন করে। শেখ মুজিবও হাত তুলে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, বাংলার মাটিকে আমি ভালবাসি। বাংলার মাটিও আমাকে ভালবাসে। এখনো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দৃশ্যটি।

৪

রবিউল আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী। পুরো নাম ড. মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৬৯ সালে ও থাকতো ফজলুল হক হলের ২৫৬ নং কক্ষে। আমি তখন ঢাকা শহরে মিটিং মিছিলে শ্লোগান দিয়ে বেড়াই আর রবিউলের ওখানে থাকি। মফস্বল কলেজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকায় এসে সেই অবধি এই কাজই করে বেড়াচ্ছি।

রবিউল মেধাবী ছাত্র একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে সে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলো। ব্যক্তিজীবনেও সে খুব গোছালো। আমাকে প্রায় বলে, এভাবে জীবন চলবে না। তোমার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া দরকার।

বলেছি হবে। সব হবে।

কিন্তু কবে হবে ? ওর এ কথার কোন জবাব দেয়া গেলো না।

একদিন বললাম, শোনো, তোমাকে কিছু কথা বলি। তুমি আমাকে যতোটুকু জানো, দেখেছো নিশ্চয় আমার খোঁজখবর নেয়ার খুব একটা কেউ নেই। আমার মা-বাবার চেহারা আমি কষ্ট করেও মনে করতে পারিনে। আমার বয়স যখন খুবই কম তখন অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁরা পরপারে গমন করেন। তখন আমার বয়স এতো কম ছিলো যে, শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। দুধ খাওয়ার বয়সটা বড় বোন পার করে দিয়েছেন। তারপর চাচাদের পরিবারে থেকে বেড়ে উঠেছি। আমাদের ভাইবোনদের চাচা মামা বড় দুলাভাইরা তাদের সংসারে ভাগ করে নিয়েছে। অস্থাবর সম্পদও এই কারণে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায়।

তবে তোমাকে বলে রাখি এ সবে কোনো দুঃখ আমার নেই। কোনদিন ছিলোও না। যে জীবন আমার কেটেছে এবং এখনো কেটে যাচ্ছে আমি মনে করি এর কোনো তুলনা হয় না। এ একটা অনন্য পাওয়া। অতএব, বন্ধু, এখন আর লেখাপড়া না হলেও আমার কিছু যায় আসে না। যেটুকু হয়েছে এই বা কয়জনের হচ্ছে বলো। এখন দুইটা টিউশনি করি যে টাকা পাই নিজের চলে যায়। ভালোই তো আছি। কি বলো ?

ভালো আছো ঠিক কিন্তু আমি বলি, এভাবে দিন যাবে না। একদিন তোমাকে পস্তাতে হবে।

ঠিক করলাম রবিউলের ওখানে আর থাকবো না। এর আগেও একবার পুরানো ঢাকার নলগোলায় এক ছাত্রাবাসে থেকে এসেছি। সেখানেও এক স্কুল সহপাঠী আইয়ুব হোসেনের সাথে থেকেছি। আইয়ুব পড়াশুনা করতে করাচী চলে না গেলে হয়তো রবিউলের এখানে আসা হতো না। এর মধ্যে একটা মেসের সন্ধান পেয়ে গেলাম শান্তিনগর এলাকায়। মেসের নাম মোগল হাউজ, বেশ মজার নাম। জোনাকি সিনেমা হলের পশ্চিম গা ঘেঁষে যে গলিটা চলে গেছে ঠিক তার মাথায় বাম হাতে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চার কামরার দক্ষিণ দুয়ারী সেমিপাকা ঘর। আমার কামরায় আমি এবং আরও তিন জন। মেসের বাসিন্দারা বিভিন্ন বয়সের তবে বেশীর ভাগই যুবক। চাকরী করে কেউ, কেউ পড়াশুনা করে। কেউ চাকরী করে, আবার নাইট কলেজে পড়াশুনা করে। আবার এমন অনেকে আছে যারা কি করে বোঝা যায় না। অল্প দিনেই তাদের সাথে আমার একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার বেশ ভালই লাগে। তবে যে যা করুক মোগল হাউজ রাজনীতির জমজমাট আড্ডাখানা। অবশ্য সেটা সময়ের চাহিদাও বটে। সব ধরনের লোকই এখানে আছে। ভাসানীভক্তেরও অভাব নেই। সময় সময় তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়। আমি তেমন না জড়ালেও অনেক সময় কিছু একটা বলি, তারপর শুরু হয়ে যায়। ভাসানীকে সহ্য করতে পারে না এমন কিছু লোক এখানে আছে। কেউ বলে, বাইরে ইয়া বড় দাড়ি আর তালের

আঁশের টুপি মাথায় দিয়ে মওলানা সেজেছে। ভেতরে ভেতরে আসলে কমিউনিস্ট। চিনের সাথে যোগাযোগ রাখে। আবার কেউ চিৎকার দিয়ে বলে, ভাসানী সরকারের দালাল। এমন সব কথা যখন শুনি আমার খারাপ লাগে। কারণ এই বুড়ার প্রতি দুর্বলতা আমার ছোটবেলা থেকে। স্কুলে যখন নিচের দিকে পড়ি তখন একদিন ভাসানীর মিটিং শুনতে যাই ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ থানায় এখন যেখানে মোবারকগঞ্জ সুগার মিল অবস্থিত। সেই প্রথম ভাসানীকে দেখি। সেই জনসভায় ভাসানীকে বলতে শুনেছিলাম, 'একদিকে চোর তৈরি করবা আর এক দিকে কারখানায় তালাচাবি তৈরি করবা তা হবে না।' ছোটবেলায় শোনা তাঁর এই কথার অর্থ আমি আজও বুঝতে পেরেছি কিনা সন্দেহ।

তবে যখন দেখি একদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী চেষ্টার অন্ত নেই, অন্য দিকে চলে অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা তখন বুড়ার ঐ কথাটা আমার মনে পড়ে।

সব জায়গায় একজন পালের গোদা থাকে। এই মেসেও একজন ছিলেন। তিনি চাকরী করতেন ঢাকা পৌরসভায়। বড় একরোখা মানুষ। তাঁর কথায় দ্বিমত পোষণ করলেই এক চোট লেগে যেতো। মেসটা তিনি গরম করে রাখতেন। একবার বাড়ি যেয়ে চৌদ্দ-পনের বছরের এক ছেলেকে নিয়ে এলেন। বললাম, মেসে বাবুর্চি তো রয়েছে, ওকে আবার আনা কেনো?

উত্তরে তিনি বললেন, আজকে থেকে ও এই মেসের একজন মেম্বর। এখানে খাবে আর দিনরাত মিটিং মিছিলে শ্লোগান দিয়ে বেড়াবে। এই কাজের জন্যে ওকে দেশ থেকে এনেছি। আমরা অনেকেই তো সময় পাইনে তাই।

তার এই বিশেষ ব্যবস্থায় আর যাই হোক, আমরা সবাই সেদিন খুশি হয়েছিলাম।

৫

এখানে আমরা পরিচিত হই ফেনীর বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খাজা আহমেদ সাহেবের সাথে। এলাকায় তিনি খাজু মিঞা নামে পরিচিত। তিনি এক সময় পাকিস্তান পার্লামেন্টের মেম্বর ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনেও তিনি নির্বাচিত হন। লুঙ্গি পাঞ্জাবী ছাড়া তিনি অন্য পোষাক পরতেন না। ঐ পোষাকেই তিনি নাকি এসেম্বিলিতেও যেতেন। সারা জীবন আওয়ামী লীগের হয়ে রাজনীতি করেছেন। তাঁর কোন পাসের সার্টিফিকেট ছিলো না। ছোট খাটো চেহারার মানুষ ছিলেন। জীবনে বিয়ে করেন নি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অতিথি হয়েছেন। একটু সময় করতে পারলে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাদেরকে মুগ্ধ করেছেন। একদিন সন্ধ্যার দিকে বালিশে

হেলান দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। আমরা অনেকেই ছিলাম। এরশাদ মজুমদারও ছিলেন। এরশাদ মজুমদার তখন পূর্বদেশের রিপোর্টার। একসময় অবজারভার পত্রিকায় ছিলেন। ফসল নামে নিজের একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও ফেনী থেকে বের করতেন। কথায় কথায় খাজা সাহেব বললেন, তোমরা যা-ই বলো, জয় বাংলা শ্লোগানের যে জোয়ার উঠেছে তা থামানোর ক্ষমতা কারো হবে না। এই শ্লোগান একটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

সেদিন তিনি আমাদেরকে অনেক সময় দিয়েছিলেন। অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলো অনেকে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছিলো। জয় বাংলা শ্লোগান নিয়ে সেদিন একজন এমন কিছু কথা বলেছিলেন যা শুনে খাজা সাহেব খুব হেসেছিলেন, বলেছিলেন, এক শত বছর পরে কি হবে কেউ বলতে পারে না। আমার যতোদূর মনে আছে কথাটি এরকম ছিলো যে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় জয়হিন্দ শ্লোগান উঠেছিলো দিল্লীতে। তারপর প্রায় এক শত বছর পরে ১৯৪৭ সালে গান্ধী নেহেরু যেমন মুক্ত কণ্ঠে জয়হিন্দ বলতে পেরেছিলেন, তেমনি আগামী এক শত বছরের ব্যবধানে আমরাও হয়তো সমস্বরে শ্লোগান দিতে পারবো জয় বাংলা।

মোগল হাউজের উত্তর পার্শ্বে নূরুল হক চৌধুরীর দোতলা বাড়ি। পাকিস্তানের এক কালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর ভাই নূরুল হক চৌধুরী। আমার জানালা থেকে ঐ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলা কথাবার্তা সব শোনা যায়। প্রথম প্রথম আমার ধারণা হয়েছিলো ও বাড়িতে অবাঙ্গালী পরিবার বসবাস করে। তারা সব সময় উর্দু ও ইংরেজীতে কথা বলায় স্বাভাবিকভাবে আমার এ ধারণা জন্মে। যখন ব্যাপারটা জানতে পারলাম তখন অনেকটা অবাক হয়েছিলাম। ওদের কাছে বাংলা নাকি চাকরবাকরদের ভাষা। বাঙ্গালীর কি উন্নত মানসিকতা ! তবে হামিদুল হক চৌধুরীর ভাগ্য ভালো বাংলার মাটিতে তিনি ফিরে আসতে পেরেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সম্ভবত একটি সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন এবং নিজ জেলা নোয়াখালী ঘুরেও এসেছিলেন অথচ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা কারো অজানা ছিলো না।

মেস জীবন। রবিউলকে খুব মনে পড়ে। সারা দিন কাটেই প্রায় ওদিকে, দেখাও হয় তবু ওর অভাব অনুভব করি, বিশেষ করে রাতে শোবার সময়। দেড় হাত পাশ চৌকিতে অনেকদিন দু'জনে অনেকটা শিশুর মতো জড়াজড়ি করে শুয়ে থেকেছি। কতদিন জোর করেই চাদর মুড়ি দিয়ে নিচেই শুয়েছি। ওর অনেক সহপাঠী আমার বন্ধু হয়ে যায়। পরিচয় করিয়ে দিতে কখনো কার্পণ্য করেনি। বলেছে, আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী। কখনো একটু বেশী করেও বলেছে।

এই মুহূর্তে মজিদ সাহেবের কথা মনে পড়ছে, দেশ স্বাধীন হলে এ্যাসিস্টেন্টশীপ নিয়ে বিদেশে যাবার আগে আমার সাথে দেখা হয়েছিলো। পরে আর দেখা হয়নি। শুনেছি বিদেশেই কর্মজীবন পছন্দ করে নিয়েছে। সেও রসায়ন বিভাগের ছাত্র ছিলো। রবিউলের রুমমেট হাশেম সাহেবের কথা এখানে একটু না বলে পারছি না। মনে হতো আমরা তিনজন ঐ রুমের বাসিন্দা। অনেক সময় মিটিং মিছিলে যেতে পারছে না বলে ওরা দুঃখ

প্রকাশ করেছে। বলেছি, আমি আমার মত মিটিং মিছিলে যাচ্ছি, তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। তাই আমার যখন তখন যাতায়াত হাশেম সাহেবও হাসি মুখে গ্রহণ করেছে। পরে ডাড স্কলারশীপ নিয়ে বিদেশে পড়াশুনা করেছে। এখন আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। দেখা হলে মনে হয় আমরা যেন তেমনি আছি। এমনো হয়েছে সারা দিনে কোন কথা হয়নি। কখনো বা শোবার সময় জিজ্ঞেস করেছে, রাতে খাওয়া হয়েছে কিনা। হু, বলে চাদর মুড়ি দিয়েছি এ পর্যন্তই। কখনো বলেছি শান্তিনগর যাবার কথা। শান্তিনগর গেছি শুনলে ও হাসতো। আমিও ব্যাপারটি উপভোগ করতাম। আমার কোন কিছু ওর কাছে অজানা ছিলো না। আমার আত্মীয় স্বজন, এমন কি বন্ধুবান্ধব কে কোথায় আছে সে জানতো। বোড়ন পরবর্তী সময়ে আমার স্ত্রী তখন শান্তিনগর তার বড় ভাইয়ের বাসায় থাকতো। পড়ে ইন্টারমিডিয়েট গার্লর্স কলেজে, এখন যেটা বদরুন্নেছা সরকারী কলেজ। এস. এস. সি. পাশ করে ঢাকায় এসেছে বড় ভাইয়ের বাসায় থেকে পড়বে বলে। বোড়ন এমনিতেই আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাকে আমি প্রথম যখন দেখি তখন সে ৫ম শ্রেণীতে আর আমি ৮ম শ্রেণীতে পড়ি। ছয় বছর পর তার সাথে আমার আবার দেখা হয় শান্তিনগর তার ভাইয়ের বাসায়। প্রথম দেখার স্মৃতি আমি মনে রেখেছি দেখে সে অবাক হয়! তারপর আমরা পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করি। শেষ কথাটি এখানে আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা এক সময় ঘর বেঁধেছি। অতএব, শন্তিনগর গেছি শুনলে রবিউল আর কিছু বলেনি।

৬

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ। তথাকথিত লৌহমানব ও তথাকথিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুর খান সাহেব পদত্যাগ করলেন। তাঁরই দোসর জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। সামরিক আইন জারি হলো। শাসনতন্ত্র স্থগিত হলো।

আইয়ুব খানের পদত্যাগ, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ, আগরতলা মামলা খারিজ, সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা ইত্যাদি সাফল্যকে আন্দোলনের ফসল হিসেবে গ্রহণ করলো দেশের মানুষ। ছয় দফার এগার দফার তথা সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসলকে আরো সুসংহত, আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে কাজ চলতে থাকলো সর্বস্তরে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একবার বাড়ি গেলাম তখন নির্বাচনী হাওয়া বইছে গ্রামেগঞ্জে সবখানে। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা মানুষের মুখে মুখে। বাঙ্গালী চেতনার উন্মেষ ঘরে ঘরে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের খতিয়ান মানুষের মুখস্থ।

'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' পোস্টার অসম্ভব রকম অবদান রেখেছে। আমাদের সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে, আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। উচ্চ পদে ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী। বড় ব্যবসাবাণিজ্যে আমরা নেই বল্লে চলে। পাকিস্তানের ধনী বাইশ পরিবারের সবই পশ্চিম পাকিস্তানের ইত্যাদি অর্থনৈতিক শোষণভিত্তিক পরিসংখ্যান, বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান জনমনে সহজেই রেখাপাত করেছে। সংগঠিত করেছে দেশের মানুষকে জয় বাংলা শ্লোগানে। সময় এসেছে জবাব দেবার। এবার হবে লড়াই। সবার সঙ্গে কথা বলি, দিন ভালই কেটে যায়। মানুষ ঢাকার কথা জানতে চায়। আমি দেখি গ্রামের মানুষের কাছে জাগরণের খবর পৌঁছে গেছে। বাঙ্গালীর শিকড় সজাগ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দিনের ঘটনা বর্ণনা করে শোনাই। শোনাই মিছিলের কথা, শোনাই মিছিলে গুলির কথা। কিভাবে আমাদের ছেলেরা গুলি খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে। শোনাই কেন এই মিছিল, কেন এই গুলি খাওয়া, কিসের দাবীতে এই রক্ত ঝরা।

দুদিন ঘুরে একদিন চাচার সামনে গেলাম। চাচা বললেন, তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝি।

বল্লাম, বোঝেনই যদি তবে কেন এগিয়ে আসেন না?

ছোট চাচার সাথে বেশী কথা বলা কখনো হয়ে ওঠেনি। এক সময় মুসলিম লীগ করতেন। তাঁর মুরব্বি অর্থাৎ আমার বাবা মারা যাবার পর সব কিছু বাদ দিয়ে সংসার নিয়েই থাকেন। সেদিন তিনি অনেক কথা বললেন। একটি আদর্শকে সামনে রেখে পাকিস্তান কায়েম করার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এখন শেষ বয়সে নতুন করে আর কিছু ভাবতে চান না।

আমাকে বসতে বলেই তিনি বলতে শুরু করলেন, জয় বাংলা বলতে তোমরা কি বোঝো? এতো যে জয় বাংলা জয় বাংলা করে যাচ্ছো, তা কি বুঝে করো? নাকি না বুঝেই করো। জয় বাংলা শ্লোগানের সীমানা কত দূর তা কি তোমরা জানো? ইত্যাদি অনেক কথা এক বারে বলে গেলেন। আমি চুপ করে শুনে গেলাম। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ অঞ্চলের কথা আস্তে করে বললাম। তিনি হেসে দিয়ে যা বল্লেন তা শুনে আমার ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। জয় বাংলার সীমারেখা যা দিলেন তা অনেকটা এ রকম: উত্তরে হিমালয়, উত্তরপূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তরপশ্চিম দিকে দারভাঙ্গা পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সীমান্তবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বেয়ে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা, ছোট নাগপুর প্রভৃতি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড় পুন্ড্র বরেন্দ্র রাঢ় সমতল বংগ বংগাল হরিকল প্রভৃতি জনপদ এবং এরই মাঝখানে গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী করতোয়া ব্রহ্মপুত্র পদ্মা মেঘনা ও অসংখ্য নদনদীতে ঘেরা বাংলার গ্রাম নগর প্রান্তর পাহাড় আর অরণ্য। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙ্গালীর ধর্ম ও কর্মকৃতির উৎস তথা জয় বাংলা। বললাম, তাহলে তো ভালোই হবে। হলে তো ভালোই হবে, কিন্তু হবে না বলে চাচা চুপ করে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম এসব কথা এখন চিন্তা করে লাভ কি, '৪৭ সালে দেশ

বিভাগের সময় যখন ভাবা হয়নি অথবা ভেবেও কিছু করা যায়নি। শেষে চাচা বললেন তাঁর পক্ষে এখন কাউকে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাঁর কথা কেউ শুনবেও না। বুঝলাম নির্বাচনে তিনি কোনো পক্ষই সমর্থন করবেন না এবং এও বুঝলাম হয়তো তিনি নিজের ভোটটাও দেবেন না।

৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০। নির্বাচন হয়ে গেলো। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়ে গেলো। এই বিরাট সাফল্যে একদিকে পাকিস্তানের বিভিন্ন মহলে যেমন ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেলো অন্যদিকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন স্বাধীনতার স্বপ্নে রূপ নিতে লাগলো। পরের ঘটনাসমূহ খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলো। ৩রা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলো। প্রথম অধিবেশন বসবে ঢাকায়। ভুট্টো সাহেব বেঁকে বসলেন। তিনি ও তাঁর দল অধিবেশনে বসবেন না। ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে সেটা হবে তাঁর ভাষায় কসাইখানা। ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হলো। কি হতে যাচ্ছে সামনে উৎকণ্ঠিত বাংলার মানুষ চেয়ে রইলো শেখ মুজিবের দিকে। পাকিস্তানের প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমেই হারিয়ে যেতে লাগলো। অনেক জায়গায় শুরু হয়ে গেলো বাঙ্গালী অবাঙ্গালী দাঙ্গা। সিভিল প্রশাসন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগলো। ২রা মার্চ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে দিলো। ৩ তারিখে তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে দিলো। ঐ দিনই টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। ঐ দিনই ঢাকায় জাতীয় নেতাদের সাথে ইয়াহিয়া খানের বৈঠক হয়। ২৫ মার্চ আবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। দেশের এ হেন অগ্নিগর্ভ অবস্থায় আওয়ামী লীগ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা আহ্বান করলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ঐ জনসভায়। ঘোষণা করবেন পরবর্তী কর্মসূচী। নির্ধারিত হবে বাঙ্গালী জাতির ভাগ্য। প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তেজনা। উৎকণ্ঠিত সাড়ে সাত কোটি মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলো ৭ আরিখে বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী ঘোষণার জন্যে।

৭

এলো সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেবেন জাতির উদ্দেশে। রেডিওতে সে ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে দেশবাসী। কি বলবেন বঙ্গবন্ধু আজ! আমাদের মোগল হাউজে সে কি গরম

অবস্থা! বেলা ১১টার মধ্যে দুপুরের রান্না শেষ করতে হবে বলে বাবুর্চিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেলা ১ টায় আমরা রেসকোর্স ময়দানে পৌছে যাবো ঠিক হলো। কথার শেষ নেই। কেউ বলছে আজ স্বাধীনতা ঘোষণা না দিয়েই পারে না শেখ মুজিব। কেউ বলছে এখনই সময়। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে শেখ মুজিবকে ক্ষমা করা হবে না। কেউ বলে স্বাধীনতা তো ঘোষণা হয়েই গেছে। ২ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ছাত্ররা সে কাজ করে ফেলেছে। এখন বিশ্ববাসীর কাছে শেখ মুজিবকে স্বীকৃতি চাইতে হবে এবং রেডিও মারফত আজই সে সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। খাজা আহমেদ সাহেব কিছু বলছেন না। আমরা সবাই তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না। তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন আগেই বেরিয়ে যাবেন। গত রাতেও তিনি ফিরেছেন অনেক দেরীতে। ১০টার দিকে তিনি বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন, দেখো আজ বঙ্গবন্ধু কি বলেন। সহজে ওরা ছেড়ে দেবে বলে মনে তো হয় না।

বেলা একটার দিকেই আমরা দল বেঁধে রওয়ানা দিলাম। পুরো রাস্তা জুড়ে চলেছে মানুষ। দলে দলে মানুষ। চলো চলো রেসকোর্স ময়দানে চলো। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এর দিক দিয়ে মাঠে প্রবেশ করলাম। সে এক জনসমুদ্র! যে কোনো সময় মহাপ্রলয় ঘটে যেতে পারে। শুধু নেতার আদেশের অপেক্ষা। এমন অবস্থা যে, একবার আদেশ পেলে কোথায় চলে যাবে পুলিশ মিলিটারী আর গোলা বারুদ। মাইকের ব্যবস্থা বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কাঁচা কাঁচা বাঁশে লাউড স্পীকারগুলো বাঁধা। এই সভার উদ্দেশে সম্ভবত সদ্য কাটা অসংখ্য বাঁশ আনা হয়েছে। মাঝে মাঝে একটা করে কাঠের বাক্স রাখা আছে। মানুষ যে যেমন পারছে টাকা পয়সা ঐ বাক্সে ফেলছে। আমিও একটা ছোট মোটো নোট ঐ বাক্সে ফেলি। মানুষ সব উত্তেজনায় ছটফট করছে। স্থির হতে পারছে না। এ অস্থিরতা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বহু যুগ ধরে একটু একটু করে সঞ্চিত হয়েছে এ শক্তি। কিছু একটা না ঘটানো পর্যন্ত এ শক্তি থামবে না। ছাত্রনেতাসহ অন্যান্য নেতা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। ধৈর্য ধরতে আহ্বান জানাচ্ছেন বার বার। সেকেন্ড থেকে মিনিট, মিনিট থেকে ঘণ্টা, সময় চলে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কেন আসছে না। উৎকণ্ঠিত জনতা। কি হলো ? তবে কি বঙ্গবন্ধুকে ওরা বন্দী করে ফেলেছে? এদিকে এখনই এসে যাবেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বলে বার বার সভামঞ্চ থেকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। জনতা সান্ত্বনা চাচ্ছে না। কি করতে হবে তাই শুধু জানতে চায় নেতার মুখ থেকে। অসংখ্য বাঁশের লাঠি একটার সাথে একটা তালে তালে ঠেকিয়ে এক ধরনের ছন্দময় গতি সৃষ্টি করে চলেছে।

এমন সময় এলেন বঙ্গবন্ধু। সরাসরি মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। চারদিকে চেয়ে দেখলেন। জনতার সমুদ্র লাঠি উঁচু করে গর্জন করে উঠলো। যেন সমস্বরে বলে উঠলো: তোমার কোন ভয় নেই আমরা আছি তোমার সাথে। শুধু বলো কি করতে হবে। এর মধ্যে জানা গেলো ঢাকা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার করার কথা যে ছিলো তা করা হচ্ছে না। শুরু হলো ইতিহাসের সেই যুগ সন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি লাইন বজ্র নিনাদের মতো বের হয়ে

আসতে লাগলো। ঘোষিত হতে লাগলো কি হয়েছে আর কি করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে, সেই ভাষণের প্রতিটি লাইনের পরের লাইনটি শোনার জন্যে সেদিন মানুষ নিশ্বাস বন্ধ করে ছিলো। ভাষণের এক পর্যায়ে ঘোষিত হলো, *তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ! এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।* ভাষণের শেষ শব্দ উচ্চারিত হলো জয় বাংলা। শেষ হলো ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, যে ভাষণের সাথে পরবর্তীকালে তুলনা করা হয়েছে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের। পরের দিন সকাল বেলা রেডিওতে সে ভাষণ প্রচারিত হলো। রেডিও অফিসের কয়েকজন কর্মীর সাহসী পদক্ষেপে এ কাজটি সম্ভব হয়।

সেদিন ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় বেশ ঘটা করে সবাই বসে বিবিসি শোনা হলো। বিবিসি থেকে বলা হলো, জিন্নাহ সাহেবের সাধের পাকিস্তান এবার বুঝি গেলো! এ কথা নিয়ে সেদিন মোগল হাউজে মোটামুটি একটি তর্কবিতর্ক হয়ে গেলো। কেউ বললে, ৪৭-এর দেশ বিভাগ মানবতার চরম অবমাননা এবং জিন্নাহ সাহেবের দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল ছিলো। কেউ বল্লে, ভুল একা জিন্নাহ করেননি, ভুল পণ্ডিত নেহেরুও করেছিলেন। গান্ধীজীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ৪৭ সালে ধর্মের ধুয়া তুলে জিন্নাহ সাহেব বাজিমাত করেছে আর এবার বাঙ্গালী অবাঙ্গালী ধুয়া তুলে আবার কেউ বাজিমাত করতে চাচ্ছে। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভাববার অবকাশ যেন কারো নেই। এ ধরনের নানা কথায় সেদিন মোগল হাউজ সরগরম।

মোগল হাউজের বাসিন্দাদের সম্পর্কে আগেই বলেছি, খাজা আহমদ সাহেবের কথাও আগে বলেছি। তিনি মাঝে মাঝে বিশেষ অতিথি হয়ে আমাদের মাঝে থেকেছেন। সাংবাদিক এরশাদ মজুমদার সাহেবও তেমনি থেকেছেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠ ফেনীর একজন লোক আমাদের মেসে থাকতেন বলে বলা যায় আমরা সে সুযোগ পেয়েছি। সেদিনের সে ঘরোয়া কথাবার্তায় আমরা সবাই ছিলাম। কেবল সেদিনই নয়, আরো অনেকবার আমাদের মাঝে এমন আলাপআলোচনা হয়েছে। ভারত বিভক্তির মতো একটি জটিল বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষও যে ভাবতে পারে তা আমি ঐ মেসে থাকতে দেখেছি।

এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, বৃটিশদের বাসনাকে ঠিকমত পূরণ করেছিলো তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। তা না হলে হয় ভারতবর্ষ জাতিগত চেতনার ভিত্তিকে বিভক্ত হতো অথবা বিভক্তির কোন প্রশ্নই আসতো না। কোন যুক্তিতেই পাঞ্জাব কাশ্মীর বাংলার বিভক্তি আনতে পারতো না। ভারতবর্ষের পূর্ব পশ্চিমে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে বিশাল ভারত রাষ্ট্র কায়েম করার বাসনা পূরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু যে পশুর মতো বলি হয়ে গেলো সে কৈফিয়ত কে দেবে এবং আরো যে হবে না

সে কথায় বা কে বলতে পারবে। আজো এই উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রেলওয়ে স্টেশনে বস্তিতে বসবাস করে, এখনো রিফিউজি অথবা মহাজের বলে যাদের পরিচিতি। মাতৃভূমির টানে এখন যদি তাদের বংশধররা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার জন্যে দায়ী হবে কারা। এর মূলে কারা কাজ করেছিলো? বৃটিশদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে যারা সাহায্য করেছিলো তারা কি পরোক্ষভাবে এর জন্য দায়ী নয় ?

যা ঘটে গেছে ১৯৪৭ সালে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন কারো নেই। এখন কি হবে, কি হতে যাচ্ছে, আমরা খাজা আহমেদ সাহেবকে এ ব্যাপারে কিছু বলার জন্যে ঘিরে ধরলাম। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু বড় ধরনের রক্তপাত এড়াতে চাচ্ছেন। তাই আলোচনায় বসবেন। কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে বলেছেন। আসন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তাঁর নিজের মতামত কি জানতে চাইলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, মনে হচ্ছে সামনে আমাদের অনেক কঠিন দিন পাড়ি দিতে হবে।

৮

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ পর্যন্ত আমি এই মেসে থেকেছি। এখানকার বহু স্মৃতি আমাকে ঘিরে রেখেছে। ইয়াকুব নামে এই মেসের এক বাসিন্দা মতিঝিল টিএন্ডটি নাইট কলেজে ভর্তি হয়। সে আমাকেও ঐ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে বলে। নানা সুবিধার কথা, বিশেষ করে যাতায়াত সুবিধার কথা বলে। আমি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে একদিন তার সামনে ব্যক্ত করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সন্ধ্যায় তার সাথে যেয়ে মতিঝিল টিএন্ডটি নাইট কলেজে ভর্তি হয়ে আসি। ১৯৬৯ সালে ভর্তি হই বটে কিন্তু তিয়াত্তর সালের আগে পাস করা হয়ে ওঠেনি। সেই ইয়াকুব সাহেব এখন অডিট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার।

তবে এই কলেজেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো অজিত কুমার গুহ স্যারের কাছে বাংলা পড়ার। স্যারের একটা কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। প্রায়ই তিনি ক্লাসে এসে কথাটা বলতেন, আমার ত্রিশ বছর অধ্যাপনার জীবনে একদিনও না পড়ে এসে ক্লাসে পড়াই নি। যদি কোনোদিন বাসায় পড়ে আসতে না পেরেছি তা হলে সেদিন ক্লাস নিইনি। কি আদর্শ! ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

তিনি যখন ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত ছোট গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়াতেন তখন লাইন বাই লাইন পড়াতেন। যার কাছে বই থাকতো না তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিতেন। তাঁর ক্লাসে উপস্থিত থাকার একটা শর্ত ছিলো যে, সাথে বই থাকতে হবে। স্যার যখন ঐ গল্প পড়াতেন তখন মনে হতো প্রতিটা লাইনে প্রতিটা শব্দে মিশে আছে অতৃপ্ত

আত্মার আর্তনাদ। একে তো সন্ধ্যা রাতে ক্লাস, তারপর এই সময় আমরা আমাদের দিকের বাতি কোনো কোনো সময় নিভিয়ে দিতাম, ফলে মনে হতো যেন আশেপাশে অশরীরী নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। গোটা ক্লাস নীরব। গা ছম ছম ভাব। স্যারের সেই প্রকাশ ভঙ্গী বর্ণনাতীত। তার গভীরতা যেন বিচ্ছুরিত হতে থাকতো সর্বদা তাঁর অবয়ব ঘিরে।

এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও অজিত গুহ স্যার বহুলভাবে পরিচিত ভাবতে আমার ভালো লাগে। মল্লিক ব্রাদার্সে নতুন বাংলা রচনা নামে যে বইটি কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা এখন পড়ে, সেটা শ্রদ্ধেয় অজত কুমার গুহ ও শ্রদ্ধেয় ড. আনিসুজ্জামান স্যারের লেখা। কলেজের প্রিন্সিপাল আলী হায়দার স্যার সম্ভবত একটা সম্মানী দিয়ে বা যেভাবেই হোক এমন একটা প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর কলেজের জন্য। প্রিন্সিপাল স্যার খুব কম সময়ের জন্যে আরো একজনকে এনেছিলেন, তিনি কবি জসীম উদ্‌দীন। এই বরেণ্য কবির সাথে আমি আগেই পরিচিত ছিলাম। মতিঝিল কলোনীতে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় তাঁর যাতায়াত ছিলো। তাঁর সাথে আমার দাদু সম্পর্ক ছিলো। আমিও দাদু বলতাম, তিনিও আমাকে দাদু বলতেন। মনে হয় আমাদের বয়সের ছেলেদের তিনি দাদু বলতে পছন্দ করতেন। সময়টা ঠিক মনে নেই। একদিন জিপিওর ভেতরে দেখা। হাতে অনেকগুলো খাম নিয়ে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে আসছেন। কাছে যেয়ে দাঁড়াতে স্বভাবসুলভ স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, দাদু, আমার কয়েকটা ঠিকানা লিখে দাও তো। তারপর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে ১০/১২টা হবে চিঠি বের করলেন। কোনোটা এক পাতা লেখা, কোনোটা তারও বেশী। ভক্তদের নামের একটা তালিকাও বের করলেন। একটা করে চিঠি খামে ভরেন আর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, লেখো। চিঠিগুলো বাক্সে ফেলা পর্যন্ত যা করার আমি করে দিই। একটা কথা এখানে বলার ইচ্ছে চাপতে পারছি না, সেটা হলো যতোগুলো চিঠির নাম ঠিকানা লিখেছি তার সবই মেয়েদের নাম ঠিকানা। আমি এ ব্যাপারে কিছু একটা বলাতে তিনি একটু রসিকতার সুরে বললেন, এখন তো তোমাদের দিন, দাদু।

মেসের আর একটি ঘটনা এখানে না বলেই পারছি না, যদিও তার নামটা মনে করতে পারলাম না। ঢাকায় তখন উত্তাল আন্দোলন। বেশ চট্‌পটে স্বভাবের এক যুবক থাকতো আমাদের সাথে।

একদিন সকাল বেলায় বাইরে থেকে একটু ঘুরে এসে দেখি সুন্দর ফুটফুটে হালকা গড়নের একটি মেয়ে লাল একটা শাড়ি পরে রুমে বসে আছে। ঐ ছেলেটি তার সামনাসামনি চুপচাপ বসে। আলাপ করে জানা গেলো মেয়েটি ঐ ছেলের বউ। শেষে ঘটনা যা জানতে পারি তা হলো, ছেলে বাড়িঘরে যায় না, সংসার ধর্মকর্মের ধারে কাছে নেই। শুধু মিটিং মিছিল করে বেড়ায় বলে বাপ-মা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তাও কোন কাজ হয়নি। অনেক বলে কয়ে সেদিন ঐ ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম মেয়েটির সাথে। মেয়েটির চোখের পানি সেদিন আমাদের ব্যথিত করেছিলো।

একদিন পরেই ঐ ছেলে ফিরে এসেছিলো। কোন কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারেনি। আন্দোলনপাগল সেই যুবকের আর কোন খবর জানতে না পারলেও ঘটনাটি ভুলতে পারিনি।

৯

২০ মার্চ, ১৯৭১ আমি ঢাকা থেকে বাড়ি চলে যাই। যশোর থেকে ১৩ মাইল ভেতরে চিত্রা নদীর ধারে আমার বাড়ি। নোয়াপাড়া পীর সাহেবের ছেলে হাদিউজ্জামান আমাদের আসনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। আগেই বলেছি নির্বাচনের আগে বাড়ি গিয়েছিলাম। খাজুরা সীমাখালীর মাঝখানে গাইদঘাট বাস স্ট্যান্ডে নেমে এক মাইল পথ হেঁটে বাড়ি যেতে আমার কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। মানুষের উৎকণ্ঠা চরমে। সবার প্রশ্ন: ঢাকার খবর কি? শেখ সাহেব ৭ তারিখে কেন স্বাধীনতা ঘোষণা দিলো না? পাকিস্তান থাকছে কিনা, দেশ স্বাধীন হবে কিনা ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। চাচা আমাকে একটু কাছে পেয়ে নিজেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারলে কাজ হয়ে যাবে। আগেই বলেছি আমার চাচা এক সময় মুসলিম লীগ করতেন। বেশী দিনের কথা নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল। এই সময়ের মধ্যে মানুষের আদর্শগত চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আনা কষ্টকর তো বটেই। তবু নির্বাচনের আগে আমি সাহস করে তাঁর সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলাম তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিলো আমার জন্যে আনন্দের। চারদিন বাড়িতে ছিলাম। এই চার দিনে মানুষকে অফুরন্ত আশার কথা শুনিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে বোড়নের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, সে তখন বাড়িতে, পাঠান পাইক পাড়ায়। বিয়ের পর পরই এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে সে ঢাকা থেকে বাড়ি চলে যায়। তখন তার কথা ছিলো একটাই যে, বিয়ের পরে সে তার ভাইয়ের বাসায় থাকতে চায় না। এই মনোভাবের জন্য তাকে বেশ কষ্টও করতে হয়েছে।

২৫ মার্চ বোড়নকে নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য, নাকোল গ্রামে যাওয়া। নাকোল আমার শ্বশুর বাড়ি। নাকোল মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এলাকার প্রসিদ্ধ বাজার। বৃটিশ আমলে নদী বন্দর ছিলো। ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দিন সাহেবের বাড়ি এই গ্রামে। যশোর যখন পৌছাই তখন বেলা একটা। বোড়নকে ডাক্তার দেখানো দরকার ছিলো। গেলাম সদর হাসপাতালে, সিভিল সার্জন সাহেব নিজেই দেখলেন। ঢাকা থেকে আমি ২০ তারিখে এসেছি শুনে দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু কথা হলো। এক পর্যায়ে ডাক্তার সাহেব বল্লেন, আমরা তো ভয়ে ভয়ে আছি কখন কি ঘটে যায়, শহরের অবস্থা ভালো নয়। আমরা মাগুরা যাবো শুনে ডাক্তার সাহেব আমাদের আর দেরী না করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। বলে এলাম, অবস্থা খারাপ দেখলে গ্রামের দিকে চলে যাবেন। আমার গ্রামের ঠিকানাও দিয়ে এলাম। যশোর থেকে বের হতে ৩টা বেজে গেলো। আমরা শহরের ভেতরে গেলাম না। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে চলে যাই। তাড়াহুড়া করে প্রায় চলমান বাসটিতে উঠে পড়ি। পরে জানতে পারি ঐদিন আর কোনো বাস ছাড়েনি ঐ লাইনে। আমাদের বাস যখন যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে যায় তখন বাস থামানো হলো, আবার কিছুক্ষণ

পর ছেড়ে দেয়া হলো। দেখলাম মিলিটারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাদের কমান্ডারের বক্তব্য শুনছে। পরে বুঝেছি নিরস্ত্র মানুষের ওপর কিভাবে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেই কথাই হয়তো বোঝানো হচ্ছিলো। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মাগুরা পৌছলাম। তেমন কিছু বুঝতে না পারলেও চারদিকে অস্বাভাবিক অবস্থা আঁচ করতে পারছিলাম। তাড়াতাড়ি একটি বেবী টেক্সি নিয়ে নাকোল রওনা হয়ে গেলাম এবং রাত সাড়ে ৮টার দিকে নাকোল পৌছে গেলাম। ঐ দিন আর বিবিসি শোনা হলো না। পরের দিন ২৬ তারিখ সকাল বেলা আমার ঢাকায় রওনা হওয়ার কথা। রাত ৯টার দিকে আকাশবাণী কলকাতা থেকে শুনতে পেলাম ২৭ তারিখে আওয়ামী লীগ হরতালের ডাক দিয়েছে। তাই ২৮ তারিখের আগে ঢাকায় যাওয়া হচ্ছে না ভেবে ২৫ তারিখ রাত ১১ টার দিকে ঘুমাতে গেলাম।

২৬ মার্চ। সকাল বেলা। তখনো সকাল ৭টায় রেডিওতে খবর প্রচারিত হতো। রেডিওর নব ঘোরাচ্ছি তো ঘোরাচ্ছিই, কোন সাড়া শব্দ নেই। শর্ট ওয়েভ মিডিয়াম ওয়েভ কোনটাতেই ঢাকা ধরা গেলো না। দু' একটি ঝাঁকিও দিলাম রেডিওর গায়ে, তাতেও কোন কাজ হলো না। এমন সময় আকাশবাণী কলকাতা থেকে ভেসে এলো দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারী কণ্ঠ। ঢাকায় ক্রাকডাউন হয়েছে। ঢাকার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। রাত ১২টায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে মিলিটারী ঝাঁপিয়ে পড়েছে শহরে। মেশিনগান মর্টার যথেষ্ট হয়নি, তাই ট্যাঙ্কবহরসহ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুলিশ ইপিআর-এর বাঙ্গালী জোয়ানরা ভোর রাত পর্যন্ত লড়াই করেছে। ঢাকা শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে কি ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি। গণহত্যা চালানো হয়েছে সেখানে।

দেখতে দেখতে গ্রামের ছেলে বুড়া জোয়ান জড়ো হয়ে গেলো নাকোল বাজারে। সবাই উদ্বিগ্ন যতোটা না দেশের কথা ভেবে তার চেয়ে আত্মীয়স্বজনের কথা ভেবে। সবারই কেউ না কেউ বাস করে ঢাকা-চট্টগ্রাম বা কোনো না কোনো শহরে। বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফের নানা বাড়ি এই গ্রামে। আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা সোহরাব হোসেনের (পরে পূর্তমন্ত্রী হয়েছিলেন) শ্বশুর বাড়ি এই গ্রামে। তাঁর দুই শ্যালক আমার সমবয়সী। এই গ্রামেরই রেজা সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়াশুনা করেছেন। তিনি এখন বাড়িতে থেকে স্থানীয় একটি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। নাকোল রায় চরণ হাই স্কুল প্রায় শতবর্ষ আগের ঐতিহ্যবাহী একটি বিদ্যাপীঠ। এলাকাটি তাই মোটামুটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। কাজেই এখানে রাজনৈতিক আলাপআলোচনা আড্ডা বেশ জমে যায়।

দিন চলে গেলো। উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কামারখালি ঘাট পর্যন্ত যেয়ে দেখা গেলো গাড়ী-ঘোড়া চলছে না। শীতল হয়ে পড়ে আছে মহাসড়ক।

২৭ মার্চ বিকেলের দিকে হাই স্কুল মাঠে লোকজন জমে গেলো। কেউ বলছে শেখ মুজিব বেঁচে নেই, পাকিস্তানীরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। কেউ বলছে গণহত্যা চলেছে, কাজেই বেশীর ভাগ মানুষই মারা গেছে। নানা কথা নানা জল্পনাকল্পনা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটতে লাগলো। সোহরাব সাহেবের শ্বশুর মহাশয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

জনাব বাসি মিয়া বললেন, অপেক্ষা করো, দেখো, বিবিসি কি বলে। নাকোল বাজারকে ছোট-খাট একটা টাউন বলা যায়। রাত ৯/১০টা পর্যন্ত লোক সমাগম থাকে। গতকাল থেকে লোকজন যেন বাজার এলাকা ছাড়তেই চাচ্ছে না। নানা রকম আলাপআলোচনায় সবাই ব্যস্ত। বিষয়বস্তু একটাই: তা হলো এই মুহূর্তে কি ঘটছে এবং কি ঘটতে যাচ্ছে আমাদের দেশে। স্কুল মাঠে খেলার মাঠে খাল পাড়ে ব্রীজের ওপরে লোকজন ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। বাজারে বেচা-কেনা কমে এসেছে। দোকানপাট বন্ধ করার আয়োজন চলছে। নাকোল গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়ি যে পাড়ায়, সেই মিয়া পাড়ার ছেলে মামুন, পান্না ও আরবসহ বাসায় ফেরার জন্য রওনা দিয়েছি। রাত তখন সাড়ে আটটা-নয়টা হবে। এমন সময় চারদিকে হৈ চৈ। কি হয়েছে? স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। জিয়াউর রহমান আবার কে? যিনি শুনে এসেছেন তিনি বললেন, জিয়াউর রহমান একজন মেজর। মিলিটারী ম্যান।

স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়ে গেছে, এসব খবর মানুষকে উজ্জীবিত করে তুললো। যে যার মতো ছুটে গেলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্যে। একটা শিহরণ উঠে গেলো চারদিকে। এই মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে থাকা দেশবাসী যেন আলোর মুখ দেখলো। আমি ঘরে ফিরে অনেক রাত অবধি চেষ্টা করেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরতে পারলাম না। অনেক আশা অনেক আবেগ নিয়ে রাত কেটে গেলো।

২৮ তারিখ সকাল বেলা রেডিওর কাঁটা ঘোরাতে লাগলাম। বেশী সময় লাগলো না মিডিয়াম ওয়েভে ধরা গেলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটিতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আমি প্রথম যে কথাটি শুনি তা হলো, আমি মেজর জিয়া বলছি। তারপর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হলো। সেই স্বাধীনতা ঘোষণায় শব্দাবলী যা-ই থাক না কেন, আমি মেজর জিয়া বলছি এবং অন বিহাফ অব কথা দু'টি এখনো আমার কানে লেগে আছে। তারপর ঘোষণা দেয়া হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাঝেই আছেন। আপনারা একটু পরে তাঁর ভাষণ শুনতে পাবেন। এই ঘোষণাটিও সেদিন দেয়া হয়ছিলো।

বাজারে গেলাম। সকলের চোখে মুখে যেমন উদ্বেগ তেমন আনন্দ। কেউ বলছে স্বাধীনতা আগেই ঘোষণা হয়ে গেছে। দুলাল ডাক্তার বল্লেন, জিয়াউর রহমান প্রথমে ইংরেজীতে একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখন সেটা আর শোনা যাচ্ছে না। রেজা মাস্টার বল্লেন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দিলে কোন কাজ হবে না। এতে কোন স্বীকৃতি আসবে না। স্বাধীনতার ঘোষণা আসতে হবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধির কাছ থেকে। বাজারে আলাপ, যার যেমন খুশি বলে যাচ্ছে। তবে আনন্দই বেশী। এই মুহূর্তে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই যেন আমাদের স্বাধীনতা!

শেখ মুজিবের ভাষণ আর শোনা গেলো না। তবে যে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বলা হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাঝেই আছেন। তাহলে ব্যাপারটা কি

দাঁড়ালো ? জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিলো। দেশবাসী আতঙ্কিত? তাই এই মুহূর্তে এমন কথা বলা হয়েছে হয়তো দেশের মানুষকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। সত্যি ঘটনা হয়তো ভিন্ন কিছু।

২৮ তারিখ সকাল বেলা জানা গেলো ঢাকা থেকে দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে চলে আসছে। কামারখালী ঘাটে গেলে দেখা যাবে কি অবস্থা। জানা যাবে কি ঘটেছে ঢাকায়। দে ছুটা কামারখালী! ৫ মাইল হবে নাকোল থেকে কামারখালী। কামারখালী পর্যন্ত যেতে হলো না, ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত যেয়েই দেখা গেলো ২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় গণহত্যার রাতে বেঁচে যাওয়া মানুষ। দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। ঢাকার অবস্থা জিজ্ঞেস করার আর অবকাশ থাকলো না। বৌ-বাচ্চাদের পা ফুলে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। তাদের একটু সেবা করাই তখন আমাদের প্রধান কাজ। চেনা জানা দু'একটি পরিবারের সাথেও দেখা হলো। সারা পথ লোকে তাদের খাবার দিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে, বাচ্চাদের দুধের ব্যবস্থা করেছে। আমরাও যতদূর সম্ভব তা করার চেষ্টা করতে থাকি।

১০

সেই যে দলে দলে লোক আসতে দেখলাম সে আসা আর বন্ধ হলো না। দিনে দিনে দেখলাম এক ভিন্ন চিত্র। হাজার হাজার মানুষ লাখে লাখে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে নেমে পড়েছে। দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তান আর্মি শহর ছেড়ে গ্রামে-গঞ্জে ঢুকে পড়েছে। যেখানে শুনছে হিন্দু আছে সেখানে আগুন লাগাচ্ছে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। প্রাণের ভয়ে মানুষ ছুটে পালাচ্ছে ঘরবাড়ি এলাকা ছেড়ে। নেতারা চলে গেছেন ভারতে। প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হয়েছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় আছেন ক্যাপটেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান প্রমুখ। ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ করেছে মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথপুর আম বাগানে। কাছেই পলাশীর আমবাগান যেখানে ১৭৫৭ সালে হেরে গিয়েছিলো আমাদের পূর্বপুরুষরা ইংরেজের কাছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানের জেলখানায় আটক করা হয়েছে। ড. কামাল হোসেন সাথে আছেন। দেশের জনসাধারণ যাবে কোথায় ? ভারত সীমান্ত খুলে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ডাক এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ করতে হলে ভারতে যেতে হবে। সেখানে ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়েছে। ট্রেনিং নিতে হবে।

একদল শরণার্থীর সাথে প্রথম একবার মাগুরা আড়পাড়া হয়ে সীমাখালী বাজার পর্যন্ত গেলাম। আড়পাড়া থেকে সীমাখালী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। বিলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। এঁটেল মাটি। আগাম বর্ষা নেমেছে। রাস্তায় হাঁটু সমান কাদা।

সীমাখালী থেকে বাড়ি চলে গেলাম। সীমাখালী ঘাট পার হলেই আমার বাড়ি। আগেই বলেছি পাঠান পাইকপাড়া গ্রামে চিত্রা নদীর ধারে আমার বাড়ি। আমার স্বপ্ন।

২৬-২৭ মার্চ যশোর শহর থেকে অনেক লোক আমাদের গ্রামে এসে উঠেছে। একই গ্রামের বাসিন্দা আমার দুলাভাই আমজেদ আলী সাহেবের চাকরীর সুবাদে যশোর পিডব্লিউডি অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন সাহেবসহ তাঁর সহকর্মীরা প্রায় সবাই তাঁর বাড়িতে। বাইরের বৈঠকখানাসহ ভেতর বাড়ি ছেড়ে দিয়েও জায়গা সংকুলান হয়নি। গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে জায়গা করে দেয়া হয়েছে। নির্বাহী সাহেবের পরিবারের জন্যে একমাত্র পাকা ঘরখানা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দুলাভাইয়ের ব্যস্ততার অন্ত নেই। অফিসের বড় সাহেব বলে কথা। তারপর আছেন সহকর্মীবৃন্দ। আছে তাঁদের পরিবারবর্গ। পরিস্থিতির কারণে আজ তাঁরা সবাই তাঁর অতিথি। তাঁদের জন্যে এ এক শরণার্থী জীবনও বলা যায়। গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, যেখানে যা পাওয়া যায় তাই যোগাড় করা হচ্ছে। দেলোয়ার সাহেব নোয়াখালীর মানুষ। স্থানীয় ভাষায় কথা বলে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। ভেতর বাড়িতে আমার বোন ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু সামাল দিয়ে যাচ্ছেন। অনেক রাতই তাঁর নির্ঘুম কেটে যায়। পাড়াপ্রতিবেশীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে সহযোগিতা করে।

১৯৮৭ সালে দেলোয়ার সাহেব ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের পরিচালক হয়ে আসেন। তারপর আমার সাথে তাঁর বহুবার দেখা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর কথা তাঁর স্মরণে আছে, তাঁকে দেখে এমন একবারও মনে হয়নি।

এলাকায় সাজ সাজ রব উঠেছে। কেউ কেউ এর মধ্যে ভারতে চলে গেছে। অনেকে যাবে বলে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। মিলিটারী এখনো এলাকায় আসেনি। মানুষ আশঙ্কা করছে যে কোন সময় এসে পড়তে পারে। আমি বিশেষ করে যাদের খোঁজ করলাম তারা সবাই তখনো আছে। নিজেদের মধ্যে আলাপআলোচনা করছে। আশেপাশের গ্রামের খোঁজ খবর নিচ্ছে।

নদীর ওপার হরিশপুর গ্রামে গেলাম ডাক্তার নানার খোঁজ খবর নিতে। সর্বজনপ্রিয় ডাক্তার রামগোপাল নন্দী। ছোটবেলায় আমি যে কাঁসার গেলাসটিতে পানি খেতাম তাতে খোদাই করে দুটো ইংরেজী অক্ষর আর এন লেখা ছিলো। আমার জন্মের কিছু আগে ভয়ঙ্করভাবে আমাদের বাড়িঘর পুড়ে যায়। আমার বাপজান তখন খেজুরের গুড়ের ব্যবসার কাজে বরিশাল অথবা কলকাতায় ছিলেন। ঐ সময় ঐ ডাক্তার নানার বাড়ি থেকে যোগান দেয়া হয়েছিলো ২০-২৫ জন সদস্যবিশিষ্ট আমাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবন যাপনের অধিকাংশ জিনিষপত্র। দূর দেশে বাণিজ্যেতে যাওয়া ছিলো আমাদের বংশগত। আমার দাদার বাপ বাণিজ্যেতে গিয়ে মারা যান। বরিশাল-পটুয়াখালী-ঢাকা সেকালে নাকি আমাদের

এলাকার মানুষের কাছে ছিলো দূর দেশ। আমাদের পরিবারের সাথে ঐ ডাক্তার পরিবারের সুসম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

সারা পাড়া জনশূন্য অবস্থা। পূজামণ্ডপের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে পড়ে আমি আর কাদের এক সাথে ছোটবেলায় লুকিয়ে এখানে যাত্রাগান শুনতে এসেছি। আলো ঝলমলে রাজার পোশাক যেন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে গেলো মনে। কাদের আমার ছোট ফুফুর ছেলে। আমরা এক বয়সের। এক সাথে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে পড়েছি। বন্ধু সম্পর্ক। গান শুনতে যাওয়া, খেলাধূলা, সাঁতার কাটা, মাছ ধরাও ছিলো আমার নিত্য দিনের সঙ্গী।

নানী বলে ডাক দিতে তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নানী। বললেন, ওরে আমার দাদা, তুমি এয়েছো। বললাম, ভাবিনি আপনাকে পাবো। নানা কোথায় ? তারপর দু'জনে মিলে নানাকে খুঁজতে গেলাম। দেখি পানের বরজের কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। আদাব দিয়ে কাছে যেয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে খুশি হলেন। ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

পাড়া-প্রতিবেশী ছেলেমেয়ে প্রায় সবাই ইতোমধ্যে চলে গেছে। পড়ে আছে বুড়োবুড়ি। আশেপাশের লোকজন চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ডাক্তার নানার সামনে তাঁর বাড়িঘর লুটপাট করতে পারছে না। সামনে থেকে থেকে গেলেই কাজটা সেরে ফেলতে পারে। নানা যেতে চান না। নানী আর কি করবেন, নানার সাথেই পড়ে আছেন। মায়াভরা স্বপ্নে ঘেরা সাজানো সংসার, বিষয় সম্পত্তি ফেলে পরদেশে যেতে মন চায় না। পানের বরজে নতুন পান এসেছে। বিনুনি দিয়ে দিয়ে উঠেছে ডগা। তাকালে মন ভরে যায়।

ডাক্তার রামগোপাল নন্দী যাঁকে আমরা নানা বলি, এলাকার একমাত্র এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার তিনি। টাকা-পয়সার সাথে তাঁর ডাক্তারী পেশার কোন সম্পর্ক আছে বলে কোনোদিন মনে হয়নি। সকাল বেলায় রোগীর লম্বা লাইন পড়ে যেতে দেখেছি। তারপর যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে চলে গেছেন। এর সাথে টাকা-পয়সার কোন লেনদেন দেখিনি। ঘাটে নৌকা সব সময় একটা প্রস্তুত থেকেছে। চিত্রা নদীর তীরবর্তী প্রায় অর্ধবাঁক জুড়ে ডাক্তার বাবুর বাড়ির এলাকা। অসংখ্য ফলের আর পান সুপারির বাগান সেখানে। এলাকার গরীব মানুষেরা শুধু রোগের চিকিৎসাই পায়নি, সাথে পথ্যও পেয়েছে অনেক সময়।

শেষে নানী বললেন, তোমার নানা এখন বুঝেছেন আর থাকা যাবে না। এখন যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দেখি কি করতে পারি, বলে বিদায় নিলাম। তারপর বাড়ি এসে কাদেরকে বললাম নানা-নানীকে পাঠানোর জন্য কিছু একটা করতে হবে। কাদের আমাকে কথা দিলো এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে তাঁদেরকে বর্ডার পার করে দিয়েছিলো।

১১

একবার ঢাকা থেকে ঘুরে আসতে হবে। ২৫ মার্চ ঢাকায় ছিলাম না বলেই হয়তো এ ইচ্ছা বেশী করে কাজ করেছিলো। নাকোল এসে দেখি বাজারের মানুষ কমতে শুরু করেছে, ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে শরণার্থীর মিছিল। প্রতিদিন আমরা কয়েকজন ওয়াপদা মোড়ে যাই। মিছিলের লোকদের কিছু সেবাযত্ন করি। অনেকদিন তাদের একটু আধটু সাহায্য করতে করতে কিছু দূর এগিয়ে যাই। আবার ফিরে আসি। ফরিদপুরের দিক থেকে কামারখালী ঘাট পাড়ি দিয়ে ঢাকা রোড ধরে হাজার হাজার মানুষ স্রোতের মতো চলে আসছে। মাগুরা যশোর হয়ে শত মাইল পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ভারতে। কখনো মনে হয়েছে এ যেন সেই মহাপ্রস্থানের পথের তীর্থযাত্রার মতো। একদিন এমন একটা মিছিলের সাথে চলতে চলতে আর ফিরতে পারলাম না। এককাপড়ে যাত্রা। সাথে কিছু নগদ টাকা যা বোড়ন কয়েকদিন আগে পকেটে দিয়ে রেখেছে। গুণে দেখলাম পয়সা সমেত ৩২ টাকা। চলতে চলতে আপন হয়ে গেলো অনেকে। আমার নিজের কোনো কষ্ট নেই। মুড়ি, চিড়ে কিনে খাই, কলের পানিতে উদর পূর্তি করি। পথের দু'ধারের মানুষের সেবাও গ্রহণ করি। মাঝে মাঝে বিড়ি টানি। এ কাজটা অবশ্য একা কখনো করা যায়নি। আমার খালি হাত পা, কাজেই মিছিলের লোকদের একটু আধটু সাহায্য করতে করতে আমার পথ চলা। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলতে থাকি। মিছিল ছেড়ে চলেও যেতে পারি না, আবার ফিরেও আসতে পারি না। কারো ছোট বোঝাটা একটু নিয়ে দিই, কারো বাচ্চাটার একটু হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাই। কারো জন্যে হয়তো রাস্তার ধারের টিউবওয়েল থেকে এক ঘটি পানি এনে দিই। কখনো বা কারো জন্য টিউবয়েলটা চেপে দিই। পাকা রাস্তা। তার ওপর দু'ধারের মাটি কাদা পায়ে পায়ে উঠে এসেছে। এখন আর পাকা রাস্তা দেখা যায় না। এরই ওপর দিয়ে বিরামহীন যাত্রা।

এই হলো সেই যশোর রোড। ঐতিহাসিক যশোর রোড। এখান থেকেই এসেছে বিশ্বব্যাপী প্রচার। রচিত হয়েছে 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর মতো কবিতা। সুদূর মার্কিন মুল্লুক থেকে ছুটে এসেছিলেন কবি আলেন গিন্সবার্গ, দেখেছিলেন মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছে। রোদ বৃষ্টি কাদা উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে চলেছে। তারা বাঁচতে চায়, তারা খাবার চায়, তারা আশ্রয় চায়। তাদের ঘর ছিলো, বাড়ি ছিলো, সংসার ছিলো, এখন কিছুই নেই, অথচ তারা কোন অপরাধ করেনি।

বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ এসেছিলেন এই যশোর রোডে। স্বচক্ষে দেখে গেছেন মানুষের করুণ অবস্থা, শুনে গেছেন মানুষের করুণ আর্তনাদ। কেঁদে উঠেছে তাঁদের মানবদরদী মন, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিবেকের কাছে এ নির্মম কাহিনী। প্রতিকার চেয়েছেন বিশ্বদরবারে। এসব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

এই মিছিলে আমার এক কিশোরী বালিকার সাথে পরিচয় ঘটে। চটপটে চেহারা, মাথাভরা চুল, গায়ে প্রিন্টের ফ্রক। সারাক্ষণ কেবল পাশে পাশে থাকে। বাবা মা দাদা বৌদিকে নিয়ে এই মিছিলে তারা একটি পরিবার। ফরিদপুর জেলায় তাদের বাড়ি। সপ্তম শ্রেণীতে পড়তো মেয়েটি। স্কুলের কত গল্প, সহপাঠীদের কত গল্প, ছেলেরা কেমন দুষ্টমি করে তাদের সাথে, সে গল্প মনোযোগ দিয়ে আমাকে শুনতে হয়েছে। কতদিন কত অভিমান করেছে! ইচ্ছা করে অনেক সময় আগে পিছে বা অন্যত্র চলে গেছি। আমাকে খুঁজেছে। ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করেছে কোথায় ছিলাম।

কিশোর বালিকা বোঝেনি কোথায় সে যাচ্ছে, কেনো যাচ্ছে, আর কোনদিন ফিরে আসতে পারবে কিনা, তার সামনে কি জীবন অপেক্ষা করে আছে। মিষ্টি হাসি, একটু জোরে কথা বলা তখনো বিলীন হয়ে যায়নি তার। ফরিদপুর জেলার কোনো এক গ্রামের ঠিকানা সে আমাকে দিয়ে বলেছিলো, আপনি যাবেন। বলেছিলো, ওদের গ্রামে যেয়ে অনিতা নাম বল্লে সবাই দেখিয়ে দেবে। বিদায় কালে তার লম্বাটে চিবুকখানায় একটু আদর দিয়ে মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছি, আর তাকাতে পারিনি। অগণিত মানুষের দুঃখকষ্টের স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রইলো এক কিশোরী বালিকা। ওরা আশ্রয় নিলো শরণার্থী শিবিরে। তারপর যে কয়দিন বনগাঁতে ছিলাম বার কয়েক দেখতে গেছি ওদের। ক্রমেই মলিন হয়ে আসতে দেখেছি অনিতার মুখ।

তখন দলে দলে লোক ২৪ ঘন্টা ধরে বনগাঁয় ঢুকছে। এখানে এসেও বিভিন্ন রকম বিপদে পড়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। লোক মুখে কথা শুনে বোঝা গেলো একশ্রেণীর টাউট বাটপার লুটপাটকারী এখানেও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। টাকা-পয়সা, সোনাদানা নগদ কিছু থাকলে তা কেড়ে নিচ্ছে, কখনো বা মারধোর করে ছেড়ে দিচ্ছে, আবার কাউকে হাজতে ঢোকাচ্ছে। শুনলাম বনগাঁ জেলখানা ভরে গেছে। আরো খারাপ লাগলো শুনে যে, পূর্ব শত্রুতাবশত হোক আর বিদ্বেষপ্রসূত ক্ষোভেই হোক, কিছু মানুষ গণধোলাইয়ের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে থাকতে হয়তো কারো কোন শত্রুতা হয়ে থাকবে এখন তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাকে খুঁজছে। গ্রামকে গ্রাম মানুষ যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা যেখানে নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার, সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবতে খারাপ লাগে।

এতো মানুষের মাঝেও নিজেকে একা মনে হলো। ট্রেনিং ক্যাম্পে নাম লেখাবো তাও ইচ্ছে হলো না। একদিন অপেক্ষা করলাম পরিচিত কাউকে পাই কিনা তাও পেলাম না। পরের দিনই রওনা দিলাম যশোরের পথে।

১২

যশোর রোড ছাড়াও যশোর খুলনা বরিশাল ফরিদপুর জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের শরণার্থী হয়ে ভারতে যাওয়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিলো। যশোর শহরের ১১ মাইল উত্তরে বারবাজার থেকে পশ্চিমে যাত্রাপুর হাকিমপুর চৌগাছা হয়ে বয়রা বর্ডার পর্যন্ত। এটি ছিলো সম্পূর্ণ কাঁচা রাস্তা।

শরণার্থী মিছিল আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে বেদনা হয়ে জমে আছে। কখনো কখনো স্মৃতিপটে সে দৃশ্য ভেসে ওঠে। হাঁটু সমান কাদা ভেঙ্গে হেঁটে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। কাঁধে চড়ে চলেছে বৃদ্ধজনেরা। মায়ার বাঁধন ছিড়তে পারেনি, তাই কাঁধে করেছে। সঙ্গে নিয়েছে কিছু শুকনো খাবার আর কিছু কাপড়চোপড়। অন্তরের বত্রিশ বাঁধন ছিঁড়ে ত্যাগ করেছে ঘরবাড়ি। চলেছে কাফেলায়, বিরামহীন সে যাত্রা। দলছুট হওয়া যাবে না, পথে লুটপাট বাহিনীর ভয় আছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্যেও থামতে পারেনি মানুষ। চলতে চলতেই সেরে নিতে হয়েছে মাথায় বোঝা আর কোলে শিশু রেখে।

মাগুরা জেলা শহরের উত্তরে আঠারো খাদা ইউনিয়নের ২৯টি গ্রামের মানুষ এক সাথে মিছিল করে রওনা হয় ভারতে। মিছিলের অগ্রপশ্চাতে ছিলো গ্রামের বলিষ্ঠ জোয়ান ও নেতৃত্ব দানকারী লোকেরা, মাঝে ছিলো নারী, শিশু ও অন্যেরা। এভাবে মিছিলের মাঝে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা এগিয়ে যায়। রাতেই অতিক্রম করে আমাদের গ্রাম। এতো বড় একটা এলাকার প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী এক সাথে দেশ ছেড়ে চলে যায়। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে শরণার্থীর সংখ্যা নেহাত কম নেই। এইতো সেদিন টিভি পর্দায় আমরা দেখলাম সেই একই দৃশ্য আফ্রিকার রোয়ান্ডায়। মুখের মধ্যে মাছি অবাধে যাচ্ছে আসছে কোন অনুভূতি নেই। স্থির হয়ে গেছে চোখের পাতা। মনে হয় স্থির চিত্র দেখছি মুভি ক্যামেরায়। এ দৃশ্য মনে করে দেয় আমরা একদিন শরণার্থী ছিলাম। আমরা একদিন যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের দেশে বর্ষাকালে যদি হাজার হাজার মানুষ এক সাথে কোন মাঠের মধ্যে, রাস্তার ধারে বা কোন জংগলের পাশে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান নিই, তখন অবস্থা কেমন হতে পারে তা অনুমান করা বর্তমান প্রজন্মের জন্য কঠিন। কারণ এখন আর সেই বৃষ্টি বাদলা তেমন দেখি না, তেমন বর্ষাকালও দেখি না। যারা সে অবস্থা না দেখেছে তারা বুঝবে না সত্যিকারভাবে শরণার্থী শিবিরে জীবন কেমন ছিলো। '৭১ সালে আগাম বর্ষা নামে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিলো বেশী। বৃষ্টি বাদলা মাথায় নিয়ে মানুষ ভারতে শরণার্থী হয়। একটি মৌসুমের পুরো বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পাঁক কাদায় বসবাস করে প্রায় এক কোটি মানুষ। রেশনকার্ড সিস্টেম চালু হয়। রেশনে চাল ডাল তেল নুন মায় খড়ি পর্যন্ত দেওয়া হতো। শিশু খাদ্য দেওয়া হতো পৃথকভাবে। সেখানেও ছিলো কত ধান্দাবাজি। কেউ একাধিক শিবিরে কার্ড করেছে, কেউ রেশন নিয়ে ব্যবসা করেছে। রেশন চুরির কাহিনীও শোনা গেছে। তবে সেগুলো আমাদের লোকেরাই করেছে। লেখালেখি

বিলি-বণ্টনের কাজ শরণার্থী শিবিরের লোকেরাই করেছে। আমি যতোটুকু জেনেছি সাহায্য কম এসেছে একথা বলা যাবে না। একজন মানুষ বেঁচে থাকার মত রেশন পেয়েছে। বেঁচে থাকার মতো খাদ্য ঔষধ যত্ন যারা পায়নি তারা হলো অগণিত শিশু।

প্রতিদিন সকাল বেলা খোলা ট্রাক এসেছে লাশ সংগ্রহ করতে। এসেছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, এসেছে ডোম। প্রথমে লাশগুলো একত্রে জড়ো করেছে, যার বেশীর ভাগই শিশুদের লাশ। তারপর লাশগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে ট্রাকের ওপর। মা, জননী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে তার সন্তানের দিকে। চোখের পানি আগেই শুকিয়ে গেছে। মরার আগে স্যাঁতসেঁতে কাদায় চটের ওপর শুয়ে ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠেছে সোনামণি। হু হু করে উঠেছে জননী হৃদয়। যে সন্তান বুকে করে যে সন্তান পেটে ধরে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদীর্ঘ পথ, সে সন্তান বুকে ধারণ করে ফিরে আসতে পারেনি মা জননী। শূন্য বুকে শূন্য ভিটেয় ফিরে এসেছে। এনেছে স্বাধীনতা। সুন্দরী ষোড়শী ফিরে এসেছে সাপের খোলসের মতো গায়ের চামড়া আর জট পাকানো মাথার চুল নিয়ে।

১৩

মাস খানেক হবে নাকোল থেকে গেছি। কিভাবে গেছি, কোথায় গেছি সে কথা আগে বলেছি। ফিরে এসে শুনলাম বোড়ন প্রতিদিন পোস্ট অফিসে যেয়ে বসে থাকে। ভাবে আজ বুঝি চিঠি আসবে। পোস্টম্যান তাকে এড়িয়ে চলে। ডাক চলাচল যে বন্ধ হয়ে গেছে এ কথা সে বুঝতে চায় না। কেঁদে কেটে পথ-বাড়ি একাকার করে। সন্তানের আগমন বার্তা এসেছে বলে আরো আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে।

এখন একটু ভাবুন তো! এমন যদি হতো আমি আর কোনদিন ফিরে এলাম না। যেমন আসেনি অনেকে। তাহলে কি করতো আমার স্ত্রী, আমার সন্তান? ভাবনার এখানেই ইতি। কারণ কি করতো তাতো আজ ছাব্বিশ বছর ধরে দেখে আসছি। দূরে যেতে হবে না। ওদের পাশের বাড়ির মেয়ে আঞ্জু। বোড়নেরই সমবয়সী। তার স্বামী চাকরী নিয়েছিলো রেলওয়েতে। থাকতো সৈয়দপুর। সে ফিরে আসেনি। তারপর দুইটি শিশু সন্তান কোলে নিয়ে এরকম হাজারো আঞ্জুর দিন কিভাবে কেটেছে তা আমরা দেখেছি।

যাক্ সে কথা। বললাম, আমাকে নিয়ে কেন এতো ভাবনা ? তোমরা কেউ এখানে থাকতে পারবে না। হানাদার বাহিনী ঢুকলো বলে এই গ্রামে। ওদের একই কথা, যা হবার হবে। তুমি কোথাও যেতে পারবে না। শুনলাম হানাদার বাহিনী ইতোমধ্যে ২/১ বার

নাকোল বাজার পর্যন্ত এসে গেছে। যে কোন সময় তারা এই এলাকায় অপারেশন চালাতে পারে।

এরই মাঝে একদিন নিশুতি রাতে শত্রু হানা দিলো। চারদিকে ছোটাছুটি আর চাপা আওয়াজ। ডাকাডাকিতে ঘুমের ঘোরেই বাইরে এসে দেখি বাড়ির সবাই উঠোনে। এক্ষুণি আত্মরক্ষার্থে ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। প্রতিবেশীরা সব বেরিয়ে পড়েছে। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা ভর্তি লোক চলেছে দক্ষিণ দিকে। উত্তরে নাকোল বাজারে মীর্জা বাড়িতে ততোক্ষণে আগুন জ্বলে উঠেছে। দক্ষিণে ওয়াপদার ক্যানেল পর্যন্ত পৌছতে পারলে ক্যানেলের ধার দিয়ে ভেতর দিকে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত যাওয়া কঠিন। আধা মাইল মাত্র রাস্তা কিন্তু কাদা ভয়ানক। তারপর চলতে হবে অন্ধকারে।

পাড়ার মুরুব্বি কয়েকজন বাদে প্রায় সবাই চলে এসেছে। আমার শাশুড়ি আম্মাকে আনা যায়নি। বাড়িতে আগুন দিক, লুটপাট করুক, খুন করুক, তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজী নন।

আলো জ্বালিয়ে চলা যাবে না। তাতে বিপদ বাড়তে পারে। আমাদের পরিবারের জন্য সমস্যা একটু বেশী। বোড়নের পক্ষে এই কাদার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া কঠিন। তারপরেও পাড়ি দিতে হয়েছে। এমন করেই কঠিন সাগর পাড়ি দিয়ে একদিন শরণার্থী হয়েছে এ দেশের মানুষ। আমরা পেছনে পড়ে গেছি। যারা আমাদের দুজনকে ছেড়ে যেতে পারেনি তারা সাথে সাথে আছে। ওয়াপদা ক্যানাল ধরে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। ওয়াপদা ক্যানেল মানে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প, সংক্ষেপে যেটা জিকে প্রজেক্ট বলে পরিচিত, তার একটা খাল কুষ্টিয়া থেকে লাঙ্গলবাধ হয়ে নাকোল পর্যন্ত এসেছে। এই খালের ধার দিয়ে হেঁটে যেতে কোনো অসুবিধা হলো না। এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হলো।

মানুষ ভারতে যেয়ে অবস্থান নিয়ে শরণার্থী হয়েছে। আর ভারতে না যেয়ে যারা দেশের ভেতরেই বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে কি বলা হবে? তারাও তো এক ধরনের শরণার্থী। সব ক্ষেত্রেই নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে, খাবার দিয়ে মানুষ সহযোগিতা করেছে।

তারপর ভিজতে ভিজতে যখন আমরা বড়ালদা গ্রামে পৌছাই তখন সকাল হয়ে গেছে। আমাদের আগে যারা পৌছেছে তারা কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছে। যে যেমন পেরেছে পরিবারভিত্তিক ব্যবস্থা করেছে। আত্মীয়স্বজন পরিচিত জন সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে।

আমরা পৌছানোর সাথে সাথে ব্যবস্থা হয়ে গেলো। ঐ গ্রামের মানুষ যারা আমার শ্বশুরকে চেনেন তাঁরা একটু ব্যস্তই হয়ে পড়লেন। আমাদের কোনো অসুবিধাই হলো না। তাছাড়াও কয়েকজনকে পাওয়া গেলো যারা নাকোল স্কুলে পড়েছে, তারা বোড়নকে চেনে।

পরের দিন জানা গেলো বাজার পুড়ে গেছে। মীর্জা বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। সাথে সাথে লুটপাটও চলেছে। তবে গ্রামের ভেতরে তারা ঢোকেনি। দু'রাত ভিন গ্রামে কাটিয়ে প্রায় সবাই নিজ বাড়িতে ফিরে গেলো, আমরাও নাকোল ফিরে এলাম। কথাবার্তায় বোঝা গেলো আবারও হামলা হতে পারে। এ রকম ধারণা করার কারণ হলো হিন্দু বাড়িগুলো

এখনো পোড়ানো হয়নি। তবে লুট হয়ে গেছে। দেখা গেলো হিন্দুরা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় সোনাদানা টাকা পয়সা মাটির নিচে পুঁতে রেখে গেছে ধারণা করে বাড়ির উঠোন, কোনাকানা কুপিয়ে ফেলা হয়েছে। দরজা জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে।

এর পর কয়েকদিন নাকোল থাকলাম। আদরযত্নের অভাব নেই। কিন্তু ওরা যায়ই বলুক আর যায়ই করুক এভাবে তো থাকা যায় না। ঢাকায় একবার যাবো এমন ইচ্ছের কথা আগেই বলেছি। কিভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায় সেটা ভাবতে হলো। কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে সেটা কেমন হবে। শেষে ঠিক করলাম বলেই যাবো।

একজন সাথীও জুটে গেলো। নাম আসাদ। সে ওই আঞ্জুর ভাই যার কথা একটু আগেই বলেছি। সাভারের কাছে কোনো এক গ্রাম পর্যন্ত যাবে সে। কামারখালী ঘাটে এসে আরও কয়েকজনকে পাওয়া গেলো। তারা কেউ ফরিদপুর, কেউ বা ঢাকা যাবে। অপেক্ষা করতে থাকি। শেষে বাস একটা ছাড়লো। রাস্তাঘাটে যানবাহন নেই বল্লেই চলে। মিলিটারী গাড়ি এদিক ওদিক যাচ্ছে আসছে। ফরিদপুর যেয়ে শুনলাম গোয়ালন্দের দিকে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না। আমরা যাত্রী ১২ থেকে ১৫ জন। ফরিদপুর যেয়ে আমার একজন পরিচিত লোক জুটে গেলো। সবাই ভাবছে কি করা যায়। শেষ পর্যন্ত হেঁটেই রওনা দেয়া হলো। টেকেরহাট হয়ে বিস্তর বিল খাল ধান ক্ষেতে পাড়ি দিয়ে গেলাম পদ্মা পাড়ে। গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে তখন জেট বিমানকে চক্কর দিতে দেখা গেলো। নৌকায় পদ্মা যখন পাড়ি দিলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চরের লোকেরা কেমন করে যেন দেখছে আমাদের। চরের লোক সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, শুনেছি, এরা ডাকু প্রকৃতির। সুযোগ পেলে লুঠপাট করে। পায়ে চলা পথ। এক বাড়িতে বসে আমরা পানি খেলাম। বেটেখাটো একজন লোক দেখে আমার গা ছম ছম করে উঠলো। বিকট চেহারা। জবা ফুলের মতো টকটকে লাল চোখ। একজন বল্লে, চরের সর্দার হবে। এমন লাল চোখ আমি কখনো দেখিনি। একটা কথাও না বলে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিচের দিকে নেমে গেলো। হাতে একখানা দা। এখন যারা ঢাকা থেকে ফরিদপুর যশোর তথা ভারতে যাচ্ছে তারা এ পথটি ব্যবহার করে থাকে। আরিচা বা গোয়ালন্দ কেউ যেতে পারছে না। পরে জেনেছি এই চরেই অনেকে লুটেরা বাহিনীর শিকার হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে ভারতে যেয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা ৭ টার দিকে আমরা ঝিটকে গ্রামে প্রাইমারী স্কুলে আশ্রয় নিলাম। দেখলাম, স্কুল ভর্তি লোক। স্কুলের এক কামরায় পুরো একটি পরিবার। চোখে পড়ার মতো সুন্দরী বৌ মেয়ে আছে, শিশুও আছে। স্কুল কমিটির সভাপতি সাহেব মনে হলো বেশ সহজ সরল মানুষ। পাশেই থাকেন। এসে আমাদের সাথে দেখা করলেন, অনেক কথা হলো। রাতের খাবার তিনি খাওয়ালেন। বললেন, ২৮ মার্চ থেকে একইভাবে লোকজনকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সামনের মাঠ দেখিয়ে বললেন, এই মাঠ ভরে যেতো লোকে। এখন ভয়ে ভয়ে আছি। কোথায় যাবো বলেন, বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এই ঘর গৃহস্থালি ফেলে ? মানুষের সেবা যত্ন করেছি, এখন শুনছি সেটা নাকি ভাল কাজ করিনি।

একটা বেঞ্চের পরে রাত কাটিয়ে সকালে রওনা দিলাম। কাঁচা রাস্তা। কোথাও কোথাও ইটের সোলিং। ঐ পরিবারটি দেখলাম একটি ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রাত্রেও দেখেছি কথা না বলতে। কিছুটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি ওদের গাড়ির কাছে কাছে হাঁটতে থাকি। কিছু দূর যাওয়ার পর বুঝতে পারি ওরা অবাঙ্গালী। আর অপেক্ষা না করে জোর পায়ে হেঁটে মানিকগঞ্জে পৌঁছে যাই বেলা ১১টার দিকে।

একটু খোঁজাখুজির পর টুকুর বাসা পেয়ে গেলাম। ওর বর জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার। কাজেই বাসা খুঁজে বের করতে দেরী হলো না। টুকু আমাকে দেখে স্বভাবসুলভ হৈ চৈ করে উঠলো, ও-তুমি, কোত্থেকে ক্যামনে উদয় হলে ? এসো, ভেতরে এসো। দেখলাম বুবু ওখানে। বুবু মানে টুকুর নানী, আমার ফুফাতো বোন। তাই তার সাথে আমার নানা-নাতীন সম্পর্ক। খেতে খেতে অনেক কথা হলো। ওরা ভেতরে কোনো এক গ্রামে চলে গিয়েছিলো। সেখানে এক গৃহস্থ বাড়িতে ছিলো অনেক দিন। তারা একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলো ওদের জন্যে। থাকা খাওয়া বাচ্চার দুধ কোনটাই অসুবিধা হয়নি। ছাব্বিশে মার্চ ওরা শহর ছেড়ে চলে যায়। সেই গ্রামের মানুষের আদরযত্ন সহজ সরল জীবনের কথা অনেক শোনা হলো। সেদিন আর ঢাকায় যাওয়া হলো না। বুলবুল মানে ম্যানেজার সাহেব আমাকে দেখে একটু মিষ্টি হাসি দিলেন। তবে পরিস্থিতি তাকে ভাবগম্ভীর করে তুলেছে। চাকরী করতে হচ্ছে, তারপর আত্মীয়স্বজনও সব ঢাকায় থাকে। পরিচিত নেতাকর্মী যারা ছিলো তারা সব চলে গেছে। কখন কি ঘটে যায়! সব কিছু মিলিয়ে বেশ অসহায় বোধ করছেন তিনি।

সকাল বেলা একটু তাড়াহুড়া করেই রওনা দিলাম। বের হবার সময় টুকুর সেই তীক্ষ্ণ কথা, দেখো, রাস্তাঘাটে গুলি খেয়ে মরো না যেনো। পথে টুকুর কথাটায় বার বার মনে হতে লাগলো। মরতে তো হবেই। না মরলে দেশ স্বাধীন হবে কি করে ? রাস্তাঘাটে মরতে হবে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে মরতে হবে, ফাঁসিকাষ্ঠে মরতে হবে, তবে তো দেশ স্বাধীন হবে। এই সময় টুকুর আরো একটা কথা মনে পড়ে। কথায় কথায় একদিন বলেছিলো, তুমি রাজনীতিতে যেতে পারো। দুই ধরনের লোক রাজনীতি করতে পারে। এক. যার সব কিছুর নিশ্চয়তা আছে, আর এক. যার কিছু নেই। তুমি শেষের দলে পড়ো, কাজেই তুমি যেতে পারো। বছর দুয়েক আগে মিছিলে যাওয়া নিয়ে কথাটা সে আমাকে বলেছিলো। তখন সে ঢাকায় কলেজে পড়ে। বাপ-মায়ের সাথে মতিঝিলে থাকে।

নয়ারহাটে একটু দেরী করে ভিড় কম দেখে একটা বাসে উঠে পড়লাম। গাড়ি কম, তাই মানুষ কম মনে হলো না। মানিকগঞ্জে শুনেছি মিরপুর ব্রীজের ওখানে বাস থেকে বাঙ্গালীদের নামিয়ে রাখছে। বাঙ্গালীদের জীবন এখন ওদের মর্জির পরে নির্ভর করছে। ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে ছেড়েও দিতে পারে। আমিন বাজার ছেড়ে ব্রীজের কাছে এলাম। দেখলাম, ব্রীজের কাছেই চিল শুকুনে লাশ ঠুকরে খাচ্ছে, কুকুরগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। কঙ্কাল পড়ে আছে এদিক সেদিক। শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেলো, এ কোথায় এলাম!

মিরপুর মাজারের রাস্তার কাছে এসে দেখলাম, মানুষ গম গম করছে চারদিকে। আশেপাশে জোরে জোরে রেডিও বাজছে। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাঙ্গালীরা। মিরপুর ছেড়ে, কলেজগেট ছেড়ে, আসাদ গেট ছেড়ে এসে ভয়টা কিছু কেটে গেলো।

১৪

কিন্তু এ কি দেখছি! এ কোন্ নগরীতে ফিরে এলাম ? ২০শে মার্চ আমি কি এখান থেকে গিয়েছিলাম? এ কি আমাদের সেই ঢাকা শহর, না কোন মৃত নগরী ? ইতস্তত কিছু লোকজন চলাফেরা করছে। দোকানপাট কিছু কিছু খোলা দেখা যায়। শান্তিনগর পৌছে মোগল হাউজে গেলাম। চারদিকে ঘাস বড় হয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িওয়ালাকে খোঁজ করতে লাগলাম। একটু পরে তাঁকে পাওয়া গেলো। বল্লাম ঘরটা খুলতে। ভদ্রলোক ঘর খুলতে আমতা আমতা করতে লাগলেন। বললাম, আমার কাজ আছে, আপনি খুলুন। দরজা খুলে দিলে দেখা গেলো, ঘরে চৌকি ছাড়া আর কিছু নেই। আমার বিছানা-বই-খাতা-পত্র কোথায় গেলো জানতে চাইলে তিনি বললেন, ২৬ তারিখে সকাল বেলা সব কিছু ফেলে দিয়েছি। বইপত্র দেখলে এখানে ছাত্র থাকে জানলে ওরা আমাদের মেরে ফেলে দিতো, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো, তাই সব ফেলে দিয়েছি। মোগল হাউজের পশ্চিমে অদূরেই একটি মজা ডোবায় সব কিছু ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। ফেলে দেয়া জিনিষপত্রের অংশ বিশেষ তখনো দেখা যাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম। বুকটা ভারী হয়ে উঠলো। শুনেছি কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে আগে তাদের পাঠাগারগুলো ধ্বংস করতে হয়।

কাছেই মনসুর উদ্দীন স্যারের বাসা। একটু খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কাউকে পেলাম না। আমাদের মেসের পশ্চিমে দুটো বাড়ির পরেই স্যারের বাসা। এই বাসার বারান্দায় কত দিন স্যারকে মোড়া পেতে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। স্যারকে ওরা মেরে ফেললো নাতো ? স্যারের কথা ভাবতে ভাবতে এগোতে থাকি । এই মেসে এসে প্রথম প্রথম যখন দেখতাম স্যারকে বিকালে এই পথে হাঁটতে তখন খুব ইচ্ছা হতো কথা বলতে। কিন্তু সাহস হতো না। স্যার আবার কখনো একা বের হতেন না, সঙ্গে একটি মেয়ে থাকতো। কোনো কোনো দিন দুটি মেয়েও থাকতো। একদিন সাহস করে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কাছে কাছে আসতে সামনে যেয়ে সালাম দিলাম। চোখ তুলে আমার

দিকে তাকালেন, আমি কেমন যেনো চুপসে গেলাম! কোনো রকমে বললাম, আমি এই মেসে থাকি। আমার অবস্থা দেখে সাথের মেয়েটি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

আমি জানি আমার ঘটে কিছু নেই। বটবৃক্ষের সান্নিধ্য কেমন লাগে এইটুকু শুধু উপলব্ধি করার চেষ্টা। আবহমান বাংলার লোকসাহিত্যবিশারদ হারামণির সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেবের পেছনে পেছনে কিছুদিন কিছু সময় হাঁটার সুযোগ আমার হয়েছিলো। এটাই আমার অনেক পাওয়া বলে আমি মনে করি। হারামণি সম্পর্কে দুটো কথা স্যারের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিলো। স্যার সম্পর্কে আমার শেষ কথাটি এখনই বলে রাখি। ১৯৭৯ সালে লালনকে নিয়ে তিনদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো কুষ্টিয়া লালন পরিষদ। কুষ্টিয়া শহরের পূর্বদিকে প্রায় শহরের গাছুয়ে ছেউড়িয়া গ্রামে লালনের মাজার, কেউ বলে লালনের আখড়া। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো অগণিত দর্শক-শ্রোতা, সেই অনুষ্ঠানে লালনের গানের এমন সব শিল্পীকে উপস্থিত করা হয়েছিলো যারা গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে একতারা হাতে লালনের গান গেয়ে বেড়ায়। এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।

আমি চাকুরীর সুবাদে তখন কুষ্টিয়াতে। এক ফাঁকে দেখা করতে গেলাম। বললেন, তুমি না শান্তিনগর আমার বাসার কাছে থাকতে, যোগাযোগ রাখনি কেনো? আমি কিছু বলতে পারিনি। অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিয়েছি।

বৃদ্ধ বয়সে কুষ্টিয়ায় গিয়ে যিনি লালনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তিনদিন ধরে উপস্থিত থাকতে পারেন, তিনি যৌবনে হারামণি সংগ্রহে কি পরিমাণ ছুটেছিলেন তা সেদিন কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

শান্তিনগর বাসায় উঠলাম। আগেই বলেছি শান্তিনগর বোড়নের বড় ভাইয়ের বাসা। মোকাব্বের হোসেন খান বোড়নের বড় ভাই, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। আমরা ডাকি মনা ভাই বলে। শুল্ক বিভাগে চাকরী করেন। এখন আছেন নারায়ণগঞ্জে। বাসায় পৌঁছে শুনলাম সেখানে যেতে হবে বিশেষ খবর নিয়ে। মনা ভাই সম্পর্কে দুটো কথা এখানেই বলে রাখি। ষাটের দশকে তিনি একনাগাড়ে অনেক বছর যশোর সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। একই সময় তিনি মতিঝিল কলোনী ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কাস্টমস একজিকিউটিভ অফিসার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। আজীবন সদস্য হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সব সমিতির জন্য কাজ করে গেছেন। সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো। বুদ্ধিজীবী হত্যার শিকার দৈনিক ইত্তেফাকের মরহুম সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিলো।

পরদিন সকালেই রওনা দিলাম। রিকসা করে সদরঘাট গেলাম। নবাবপুর রোডে দেখলাম চারদিকে অবাঙ্গালীরা ভূতের মত দাঁত বার করে হাসছে। আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো, গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো। জগন্নাথ কলেজ দূর থেকে একটু দেখে নিলাম, ভেতরে যাবার সাহস হলো না।

লক্ষ্যে যাচ্ছি। চোখে পড়লো হরগঙ্গা কলেজ। মাঠ ভর্তি লোককে পুলিশী ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। লুঙ্গি মালকোচা মেরে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে লাঠি হাতে দৌড় ঝাঁপ করছে সবাই। আগাগোড়া সাদা ড্রেস পরা কিছু লোক তাদের ট্রেনিং দিচ্ছে। ঐ প্রথম শুনলাম রাজাকার শব্দ। ট্রেনিং দিয়ে এদেরকে রাজাকার তৈরি করা হচ্ছে পাকিস্তান রক্ষা করার কাজে সহযোগিতা করার জন্যে। সেদিনই ফিরে এলাম ঢাকায়। ঢাকা আর ঢাকা নেই। সন্ধ্যার পরে কেউ ঘর থেকে বের হয় না। নিজের ছায়া দেখলে নিজেই ভয় পায় এমন অবস্থা।

পরের দিন প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইউনিভারসিটির দিকে গেলাম। উদ্দেশ্য, পরিচিত কারো খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। ফজলুল হক হলের গেট পর্যন্ত গেলাম। দুটো কুকুর উঠে দাঁড়ালো—কোন শব্দ করলো না। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। জগন্নাথ হলের একটি দেয়াল ট্যাঙ্ক দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ইউনিভারসিটি এলাকায় ঘোরাঘুরি নিতান্তই নির্বোধের কাজ হবে তাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম।

ভাবী সাহেবা বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন। গেলাম শান্তিনগর বাজারে। গোটা বাজারটা পুড়িয়ে দিয়েছে ২৫শে মার্চ। এমনভাবে পুড়িয়েছে যে, টিনগুলো সব লোহালক্কড়সহ দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে কালো হয়ে পড়ে আছে। ২৫শে মার্চের চিহ্ন চারদিকে। মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আশপাশের পাকা বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি। পরিচিত ২/১ জন লোকের সাথে দেখা হলো। অন্যদের খবর জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, সেই যে ২৬শে মার্চ তারা ঢাকা ছেড়েছে আর ফিরে আসেনি। চাকরী করে এমন অনেকে ফিরে এসেছে কিন্তু এখন এ এলাকায় থাকে না। ২৫শে মার্চে অনেকে মারা গেছে। মারা গেছে এমন অনেকের নাম জানা যায়নি। বাজারে কেউ কেউ বল্লো, এলাকায় এলাকায় 'পিস' কমিটি করার কথা হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে সরকার। বল্লাম, কোন্ সরকার ? এ কথা বলাতে আমার দিকে কেউ কেউ ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকালো। আমি দেরী না করে সরে পড়লাম।

আবার বের হলাম। এ এলাকায় আগাখানীদের বসবাস ভাল। পল্টনে ওদের জামাতখানা। ওরা দেখলাম বেশ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। বায়তুল মোকাররম, নবাবপুর প্রভৃতি স্থানের বেশীর ভাগ দোকান ওদের। শান্তিনগরে ওদের ছেলেমেয়ের জন্য পৃথক স্কুল আগেই ছিলো। স্কুলটির নাম 'ডন'। যাবার সময় দেখলাম স্কুলটি চলছে, ছেলেমেয়েদের কোলাহলে মুখরিত পরিবেশ। মনে হলো শরণার্থী শিবিরের কথা। কি জীবন তারা যাপন করছে ? বই-খাতাপত্রের জীবন থেকে কোথায় চলে গেছে। অধিকাংশ শিশু মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। শুনেছি, শরণার্থী শিবিরে স্কুল খোলার কথা চিন্তাভাবনা করছেন অনেকে। কিন্তু তা করা সম্ভব হবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। রাজারবাগের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। চারদিকে সব দেখেশুনে ভয় করতে লাগলো। ঢোলা লম্বা কুর্তা পরে বড় বড় সাইজের মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনলাম, এরা নাকি মিলিশিয়া বাহিনী! এ দেশের শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এদেরকে পাকিস্তান থেকে জাহাজ ভরে আমদানী করা হয়েছে।

গেলাম টিএন্ডটি নাইট কলেজের গেটে। ভেতরে যেতে ইচ্ছে হলো না। দেখলাম কলেজের অফিস কক্ষ খোলা। কলোনীগুলোতে লোকজন আছে, তবে সংখ্যায় কম এবং রাস্তায় লোক খুবই কম। ফকিরাপুল এলাম। সেভ করবো ভাবলাম, কিন্তু সেলুনে ঢুকতে সাহস হলো না। মনে হলো আমার বাংলা কথা শুনে ওরা গলায় ক্ষুর বসিয়ে দিতে পারে। দোকানে অবাঙ্গালীরা সব হল্লা করে কথা বলছে আর পান খাওয়া দাঁত বের করে হাতে তুড়ি মেরে হাসাহাসি করছে। আশেপাশে মিলিশিয়ারা চেয়ার পেতে বসে আছে। মতিঝিল, সচিবালয়, সেগুনবাগিচা ঘুরে ফিরে যতোদূর দেখলাম লোকজন মোটামুটি অফিস করছে। কি পরিমাণ চেয়ার সে সময় খালি ছিলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ জরিপ কেউ করেছে কিনা আমার জানা নেই। তবে জনগণ খালি করে দেয় অনেক কিছু। এক কোটি লোক বাড়ি-ঘর খালি করে দিয়ে চলে যায়। কৃষক-শ্রমিক কাজ ছেড়ে উঠে আসে। ছাত্র সমাজ স্কুল কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। শিশুর হাসি, রাখালের বাঁশি থেমে যায়। কাজেই ঐ সব চেয়ার খালি থাকা না থাকায় কিছু এসে যায়নি।

রাশেদ ভাই তাঁর অফিসে আমাকে দেখা করতে বলেছেন শুনে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। রাশেদ ভাই তখন পুলিশের ডিএসপি কিম্বা এসপিও হতে পারেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। শুনেছি ২৫শে মার্চের পর রাশেদ ভাই যখন বাসা পাল্টিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন তখন পুলিশ অথরিটি তাঁকে খুঁজে বের করেছিলো। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর শাস্তি অনিবার্য। ভয়ে ভয়ে তিনি দেখা করতে গেলেন। শাস্তিতো দূরের কথা, তাঁকে তখনই দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিলো।

নাম বলতে সেন্ট্রি সোজা তাঁর কাছে নিয়ে গেলো। বসতে বলে পরে রাশেদ ভাই একখানা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, তোমার গ্রাজুয়েশন থাকলে একবারে এস আই পদে দিয়ে দেয়া যেতো। আগামী কালই জয়েন করে ফেলো। আমি তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। খামটি তাঁর সামনে আস্তে আস্তে খুলে দেখলাম, আমাকে এ এস আই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লাম, এবার তাহলে আসি। সালাম দিয়ে বের হয়ে এলাম। মন তোলপাড় করে উঠলো। এতো বড় বিশ্বাসঘাতকতা ! মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে আমাকে। ধিক এ জীবন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে রাশেদ ভাইয়ের সাথে আমার আর দেখা হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তিনি এসপি হিসেবে বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তানীদের যেমন তাঁকে দরকার ছিলো, বাংলাদেশ সরকারেরও তাঁকে দরকার পড়েছিলো। মাঝে কত পানি বয়ে গেলো পদ্মা মেঘনা যমুনায়!

১৫

শান্তিনগর থেকে বাসে গুলিস্তান। গুলিস্তান থেকে বাসে মিরপুর গাবতলী। কলেজ গেট ছেড়ে এখনকার টেকনিক্যাল বাস স্ট্যান্ডে যেয়ে চোখে পড়লো টিক্কা খানের নাম। এখনকার দারুস সালাম সড়ক যেটা মিরপুর ১ নং পর্যন্ত গেছে ঐ রাস্তার দক্ষিণের মাথায় সাইন বোর্ডে লেখা টিক্কাখান রোড। নামটা দেখে বাসের জানালা দিয়ে থু করে একদলা থুথু ফেলে চুপচাপ বসে রইলাম সামনের দিকে চেয়ে। গাবতলী বাস থামলো। মিরপুর গিজ গিজ করছে মানুষে, আগেই বলেছি। তাদের সব যে অবাঙ্গালী তাও বলা যাবে না। আমি যে বাসে গাবতলী এসে নামলাম, ঐ বাসেও বাঙ্গালী নিতান্ত কম ছিলো না।

নয়ারহাটের বাসে উঠে আরিচা রওনা দিলাম। রাস্তায় মিলিটারী গাড়ির বহর। পাবলিক বাসও আছে। আরিচা ঘাটে পৌঁছে দেখি ফেরি ভর্তি জলপাই রংয়ের গাড়ি। দু'একটা তখনো উঠছে। আমার মতো পাবলিক যারা উঠেছে তারা ফেরির একদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

বাতাস একটু জোরেই বইছে। বেশ বড় বড় ঢেউ উঠেছে। মাঝনদীতে ফেরি দুলছে। আমার আনন্দ হচ্ছে, উঠুক ঢেউ আরো জোরে, মরুক শালারা পানিতে ডুবে।

চা খাবো বলে কেন্টিনে গেলাম। ঢুকেই দেখি পাকিস্তানী আর্মি ঘর ভরে আছে। মেশিনগান হাতে সবাই বসে আছে। ঢুকতেই এতোগুলো শত্রু চক্ষু আমার পরে পড়লো। আমি এক পলকে ব্যাপারটা আঁচ করে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে এগিয়ে যেয়ে চা দিতে বললাম। এই সময় একজন একটু সরে আমাকে বসতে আহ্বান করলো যা আমি তার কাছ থেকে আশা করিনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিয়ে আমার সাথে চা খেতে আহ্বান জানালাম। সে বেশ ভদ্রতার সাথে প্রত্যাখান করলো। তার সাথে আমার দু'একটা কথা হচ্ছে দেখে অন্যেরা চোখ ফিরিয়ে নিলো। বেশীর ভাগই চুপচাপ। কেন্টিনের গোল ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল জলরাশি। লক্ষ্য করলাম সে ঘন ঘন সেদিকে তাকাচ্ছে। এক ফাঁকে জানতে চাইলাম এই বিশাল জলরাশি কেমন লাগছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটু ম্লান হাসিতে জানালো ঝিলাম নদীর পাড়ে তার বাড়ি। পানির সাথে তার পরিচয় ছোটবেলা থেকে, কিন্তু এ দেশে আসার আগে এতো বড় নদী, এতো খাল বিল সে দেখেনি। ছোট্ট করে বললাম, এখানকার সব কিছু তোমাদের ওখান থেকে ভিন্ন। তাকে শুনিয়ে বলতে পারলাম না, এটা যে পৃথক একটা দেশ তাতো সে নিজেও প্রকারান্তে স্বীকার করলো।

ঢাকায় গিয়েছিলাম এটা একটা উল্টো ব্যাপার। তাই সবার জিজ্ঞাসা, ঢাকা শহরের অবস্থা কি, সব মানুষ ঢাকা শহর ছেড়ে চলে গেছে কিনা, অফিস-আদালত চলে কিনা, গাড়ি ঘোড়া চলে কিনা ইত্যাদি। নানা প্রশ্ন, কৌতূহলও বলা যায়। বলেছি আমরা যে ঢাকাকে চিনতাম সে ঢাকা এখন নেই। মনে হয় ভিন্ন কোনো দেশ।

নাকোল এসে শুনলাম পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ চলাফেরা করতে পারছে না বিকৃত হয়ে যার নাম হয়েছে 'ডান্ডি কার্ড'। রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে জবাবদিহি

করে চলতে হবে সবাইকে। রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে দু'ধরনের মানুষ। দিনমুজুর শ্রেণীর কিছু কিছু লোক যারা রাজাকারে যোগ দেওয়াকে পুলিশের চাকুরীর মতো মনে করছে। অন্যের ক্ষেতখামারে বাড়ি ঘরে কাজ করে খাওয়ার চেয়ে একটা চাকরী করতে পারলে মন্দ কি! মুক্তিযুদ্ধ কি জিনিস, স্বাধীনতা কি, এ সব উপলব্ধি তাদের নেই, বরং হাতে অস্ত্র পেয়ে অর্ডার ফলো করার জন্য হিংস্র হয়ে উঠেছে। আর এক ধরনের লোক জেনে শুনে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করতে নেমেছে এবং এরাই সত্যিকার রাজাকার। নিজেদের তারা ইসলাম ধর্মের ধ্বজাধারী মনে করে। পাকিস্তান না থাকলে এ অঞ্চলে আর ইসলাম বলে কিছু থাকবে না এ অসার থিওরি তারা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে। এ সব কর্মের মূল পরিকল্পনায় যারা আছে তাদের ঐ সব রাজাকার কেউ চেনে না, জানে না।

বাজারে লোকসমাগম নেই বল্লে চলে। এলাকায় হিন্দুদের বসবাস উল্লেখযোগ্য। এখন তারা সব ভারতে চলে গেছে। তাদের বাড়িঘর লুট হয়ে গেছে। লুটেরারা ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। গ্রামে এখন যারা আছে তাদের এ সব রক্ষা করার দায়িত্ব ছিলো, এ কথা বলাতে অনেকে ক্ষোভের সাথে বল্লে, গ্রামের লোকেরাই তো লুট করেছে। গ্রামের লোকের সহযোগিতা ছাড়া কি আর ভিন গ্রামের লোক এসে এভাবে লুট করতে পারে? যারা এ কাজ করেছে তারাই এখন খোঁজ করে বেড়াচ্ছে কোন্ বাড়ির ছেলে ভারতে চলে গেছে, কে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

বাড়ি যাচ্ছি বলে নাকোল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, বাড়ি হয়ে ভারতে চলে যাবো। সময় অনেক চলে গেছে আর দেরী করা যায় না। এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানেও হয় না। পরিস্থিতি দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। গ্রামে ঢোকার মুখে সীমাখালী বাজারে বসলাম। কয়েজনের সাথে কথা হলো। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না আমি ঢাকা থেকে এসেছি। ঢাকায় যা দেখে এলাম তার কিছু কিছু ব্যক্ত করতে হলো। এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি শুনলাম। শক্তিশালী রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী নিয়ে এই মুহূর্তে এরা মাথা ঘামাচ্ছে না। এদের মাথা ব্যথা নকসালদের নিয়ে, যে নকসালরা ইতোমধ্যে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে। প্রকাশ্যে খুন করেছে আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম খানপুরের নজির চেয়ারম্যানকে। তাঁর বোন যশোরের আয়েশা সর্দার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ঘর থেকে টেনে এনে উঠোনে ফেলে জবাই করে খুন করেছে আমাদের গ্রামের আমার নিকট আত্মীয় ইসরাফ আলী খানকে। হাটেবাজারে হলুদ কেনাবেচা করে সংসারে একটু সচ্ছলতা এনেছিলো আমাদের গ্রামের জালাল উদ্দিন, তাকে নকসালরা এমনভাবে হত্যা করেছে যাতে তার আর্তনাদ সারা গ্রামের মানুষ শুনতে পায়। সন্ধ্যার সময় গ্রামের মাঝে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে বাঁচিয়ে রেখে হত্যাকাণ্ডটি চালানো হয়েছে। এভাবে সারা বাঘারপাড়া ও শালিখা থানায় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে নকসালরা। এই অবস্থায় রাজাকাররা কার্যকরভাবে নকসালদের তাড়া করেছে দেখে এলাকার মানুষ রাজাকারদের প্রতি কিছুটা নমনীয়।

কিছু যে বুঝলাম না তা ঠিক নয়। বাস্তবে এসে এই যদি হয় শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থা তাহলে এলাকার মানুষের আর দোষ কি! যা হোক, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের ফলে অন্য কোন সংগ্রাম ধোপে টেকেনি।

তবে আমাদের গ্রামের কোনো ছেলে রাজাকারে নাম লেখায় নি শুনে খুশি হলাম। গ্রামের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর ব্যতিক্রমও হতে পারতো। গ্রামের নাম পাঠান পাইক পাড়া। কেউ কেউ মুখে মুখে এটাকে বানিয়েছে পাঠান পাক পাড়া। এই গ্রামে কোন হিন্দু পরিবারের বসবাস নেই। বেশীর ভাগ মানুষের নামের শেষে জুড়ে দেয়া আছে খান পদবী। এই গ্রামের মানুষ তাই একটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। ঘটেছেও তাই, মিলিটারী আমাদের গ্রামে যায়নি, এমন কি রাজাকাররাও তেমন যায়নি। এদিকে বাস্তবে ঘটেছে ভিন্ন ঘটনা। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই গ্রামের মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তা উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ৪ জন যা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। যাঁর কথা উল্লেখ করিনি তার নাম আলম। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে আলম মারা যায় খুলনা সেকটরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে আলম বিয়ে করেছিলো আমার এক চাচাতো বোনকে। বোনটি আমার আজও সাদা কাপড় পরে যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন ওর সাথে আমার হৃদয়ও হাহাকার করে ওঠে।

১৬

গ্রামে ঢোকার মুখে শুনলাম, সুফি মারা গেছে। প্রথমেই সুফিদের বাড়িতে গেলাম। ওর মার কান্না দেখে নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন হয়ে গেলো। সুফি যশোর ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েছে। এখন তার লাশ পড়ে আছে সেখানে। খবর এসেছে, এখনো লাশটা আছে। শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, পরে গেলে আর কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। আমার ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে গেলো। সুফি আমার ছোটবেলার খেলার সাথী ও সহপাঠী। সুফি বলে সবাই ডাকে, আসল নাম সফিউদ্দিন। এক সাথে প্রাইমারী স্কুলে পড়েছি। সুফি আমাকে দোষারোপ করে বলতো, তোর জন্যে আমার লেখাপড়া হলো না। কথাটা মনে হলে এখনো আমার কষ্ট হয়। আমগাছ তলায় আমাদের ক্লাশ হতো। একদিন ছুটির পরপরই খেলা করার জন্যে আমিই ওকে প্ররোচিত করেছিলাম। ঐ খেলা 'গুলতাড়া' খেলা বলে আমাদের যশোর এলাকায় পরিচিত। ১৮ ইঞ্চি লম্বা একটি লাঠি যা ছোট হাতের মধ্যে ভালভাবে ধরা যায় তার নাম 'তাড়া' আর সমান মোটা ৪ ইঞ্চি

লম্বা সাইজের যেটা তার নাম গুল। ডাংগুলি খেলা বোধ হয় একেই বলে। খেলার নিয়মটা অনেকটা ক্রিকেট খেলার মতো। সুফি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে গুলটা ছুড়ে মেরেছে আর আমি সাপটে ছক্কা মারার মতো মেরে দিয়েছি। ঠিক সেই সময় প্রধান শিক্ষক মহোদয় অদূরেই বাই-সাইকেলে উঠছিলেন। সজোরে গুলটা যেয়ে লাগবি তো লাগ প্রধান শিক্ষকের ঠিক বাম চোখের একটু ওপরে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন সাইকেলসহ। আমি চকিতে আড়ালে চলে গেলাম। ধরা পড়লো সুফি। আমি আড়াল থেকে দেখলাম, সুফি বেদম প্রহার সহ্য করতে না পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। তারপর সে আর কোনদিন স্কুলে যায়নি। আমার সাথে জীবনে আর ভালভাবে কোনো দিন কথাও বলেনি।

শেষ পর্যন্ত সুফি এমন করেই চলে গেলো। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগলো। ওদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওটাতো সুফির লাশ নাও হতে পারে। যে দেখেছে সে হয়তো ঠিক দেখেনি। ও হয়তো ভারতে চলে গেছে। আমার কথায় কাজ তো হলোই না, বরং আরো আহাজারি বেড়ে গেলো। সুফির সঙ্গে যে ছিলো যাকে খুনিরা ছেড়ে দিয়েছে, সে নিজে এসে খবর দিয়ে গেছে। কাজেই সান্ত্বনার কোন অর্থ নেই।

ক্যান্টনমেন্টের যতোদূর কাছে যাওয়া সম্ভব, যেয়েও লাশের কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না। আশপাশের গ্রামে লোকজন নেই বললেই চলে। যারা আছে তারা কিছু বলতে পারলো না। সুফির কঙ্কালটাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। আর কোন দিনই পাওয়া গেলো না কোন খোঁজ। কেবল সুফির মার দীর্ঘশ্বাস আজো বাতাসে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সুফিকে।

ছোটবেলায় সুফি আমাকে হারাতে পারেনি, মরণে সে আমাকে হারিয়ে অমরত্বের খাতায় নাম লিখিয়ে গেছে। এখন আমিই গর্ব করতে পারি যে, আমি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সফিউদ্দিনের বাল্যবন্ধু।

এদিকে ছোট ফুফুর কান্না থামে না। খবর এসেছে ফুফুর বড় ছেলে কাদের যার কথা আগেই বলেছি সে এখন বনগাঁ জেলখানায় বন্দী। কাদের দেখতে সুন্দর। গায়ের রং ফর্সা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পাকিস্তানী গুপ্তচর সন্দেহে তাকে নাকি জেলখানায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ফুফুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কাদের জেলখানায় যদি থাকে, নিরাপদে আছে। ফিরে আসবে। তুমি শান্ত হও। গ্রামের অন্যদের মধ্যে রউফ বয়সে আমার ছোট সেও শুনলাম ভারতে চলে গেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টে চাকরী করতো আব্দুর রব ও তার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী এসে খবর দিয়ে গেছে তারা বাপ বেটা এক সাথে খুন হয়ে গেছে। আমার বড় যে ভাই, তিনি যশোরে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করেন। ফার্মের মালিক সালাম সাহেবের কার্গো, ইটের ভাটা, নির্মাণ কাজ ইত্যাদির ব্যবসা আছে। মালিক ভদ্রলোক তাঁর এই কর্মচারী, মানে আমার ভাই সাত্তার সাহেবসহ গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ঐ ফার্মের ম্যানেজার হিসেবে সবাই তাঁকে ম্যানেজার সাহেব বলে। যে ২দিন বাড়িতে ছিলাম এর মধ্যে তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়িতে আসেন। তিনি আরো বললেন যে, সালাম সাহেব ভারতে যেতে চাচ্ছেন না। দেশের ভেতরে থেকে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং যতোদূর সম্ভব সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন। এই কাজে ম্যানেজার

সাহেব যদি সাথে না থাকেন তবে নাকি তাঁর পক্ষে এ সব করা সম্ভব হবে না। মালিক জানেন মুক্তিবাহিনীর সাথে তাঁর ম্যানেজারের যোগাযোগ আছে।

একদিন ম্যানেজার সাহেব পথের বাজার ইটের ভাটায় এসেছেন শুনতে পেরে রাজাকাররা তাকে খুন করতে আসে। স্থানীয় এক কিশোর বালক ঘটনা আঁচ করতে পেরে সহজ পথে দৌড়ে এসে এ খবর পৌছে দেয় এবং এক মিনিটের ব্যবধানে আমার ভাই সেদিন প্রাণে বেঁচে যান।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, ভারত যাওয়া। যাবার সময় ফুফুজানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেলাম, আমি ভারতে যাচ্ছি, কাদেরের ব্যাপারে দেখবো কিছু করা যায় কিনা। তুমি দোওয়া করো, দেশ স্বাধীন হলে সে এমনিতে ছাড়া পেয়ে যাবে। যশোর রোড ধরে বনগাঁ যাওয়া অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, তাই খাজুরা থেকে সোজা পশ্চিমে খাজুরা বারবাজার রোড ধরে রওনা দিলাম। বারবাজার থেকে হাকিমপুর হয়ে চৌগাছা সেখান থেকে বয়রা বর্ডার। ভারতে যাওয়ার এই কাঁচা রাস্তাটির কথা আগেও বলেছি। খাজুরা ছেড়ে লেবুতলা গ্রাম ছেড়ে যতোই এগিয়ে চলেছি ততোই নির্জনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাস্তার দুধারে আগুনে পোড়া ঘরবাড়ি গাছপালা দেখা যাচ্ছে। এসব এলাকায় গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মোশেহাটি গ্রাম সামনে রেখে কেমন একটা ভীতিকর অবস্থা মনে হতে লাগলো। বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরে গেলাম। উদ্দেশ্য, ২/১ জনের সঙ্গে কথা বলা। জানা গেলো সামনে মহাসড়ক যদি পার হয়ে যাওয়া যায় তা হলে আর কোনো সমস্যা হবে না। মহাসড়ক মানে যশোর ঝিনাইদহ মাগুরা ঢাকা মহাসড়ক। ঐ সড়কে মিলিটারী গাড়ি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের নজরে পড়লে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

কিছু সময় অপেক্ষা করি। দু'চার জন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলি। এদিকে বিকাল হয়ে এলো। আমাকে চৌগাছা পর্যন্ত অন্তত আজকে পৌছাতে হবে। বারবাজার রাজাকারদের ঘাঁটি। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বারবাজার মাত্র নয় মাইল দূরত্ব। কাজেই এই রাস্তায় মিলিটারী টহল খুব জোরালো।

এই মোশেহাটি গ্রামের দুটো কথা এখানেই বলে রাখি। গ্রামটি এখন ব্যাপক পরিচিত লাভ করেছে। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি হিলারী ক্লিনটন তাঁর কন্যাসহ এই গ্রামটি ঘুরে গেছেন। এই মহামান্য অতিথি এখানে এসেছিলেন আমাদের গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ চেক ইত্যাদি প্রকল্পের কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখার জন্যে, আমাদের দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ড. মুহম্মদ ইউনুস যে কার্যক্রমের প্রবক্তা।

মহাসড়কের কাছে আরো কয়েকজনকে পেয়ে গেলাম। এই সময় ইট ভাটার আড়ালে কর্মরত বৃদ্ধ বয়সের এক কৃষক আমাদের আকারে ইঙ্গিতে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছিলো। জিজ্ঞেস করি: এই সব গ্রামের লোকজন কোথায় গেলো ? বৃদ্ধ লোকটি মাথা উঁচু করে বলেছিলো, কিছু লোক ভারতে চলে গেছে, কিছু লোক ভড় অঞ্চলে মানে ভেতরের দিকে চলে গেছে, যেখানে গাড়িঘোড়া সহজে যায় না। আরো দু'একটা কথা বলে জানা গেলো,

ঐ বৃদ্ধ নাকি এখানে থেকে এ কাজই করে চলেছে গত কয়েক মাস ধরে। মানুষকে এই রাস্তা পারাপারে সাহায্য করাকে সে তার দায়িত্ব বলে মনে করে।

সন্ধ্যার সময় আমরা পৌছে যাই চৌগাছায়। দেখি দলে দলে লোক এ এলাকা থেকে ভারতে যাচ্ছে এবং ফিরে আসছে। তারা কালোবাজারী করে। এখন অবশ্য এ কাজকে আর কেউ কালোবাজারী বলে না। তারা ব্যবসা করছে। এখান থেকে যে সব মালামাল বয়রা বনগাঁ নিয়ে গেলে বেশী দাম পাওয়া যাবে সে সব নিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে যে সব জিনিষ ওখান থেকে নিয়ে আসলে এখানে বেশী দাম পাওয়া যাবে তা নিয়ে আসছে। এ দিক দিয়ে তখনো অনেক লোক ভারতে চলে যাচ্ছে শরণার্থী হয়ে। এ রকম একটা দলের সাথে আমরাও বয়রা চলে গেলাম। সেখান থেকে বাসে বনগাঁ। বয়রা বর্ডারে ঢুকতে আমাদের একটা করে কার্ড দেওয়া হলো। কার্ড মানে নম্বর দেয়া একটি স্লিপ। বনগাঁতে থাকতেই আমার সেটা হারিয়ে যায়।

১৭

কাদেরের কথা আগেই বলেছি। তার ছোট ভাই ছাদের ও ওদের ভগ্নিপতি বারিকের সাথে পরের দিন দেখা হলো। বাড়ি যেয়ে শুনেছিলাম, ওরা কাদেরকে জেল থেকে চাড়ানোর উদ্দেশে ভারতে গেছে। আমাকে ও আমার সাথে একজনকে দেখে ওরা যেন মনে সাহস পেলো। বারিকের মুখে চাপ দাড়ি, লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরা। চেহারায় পাক্কা মুসল্লি। ওরা বললো যে, ওদের সন্দেহের চোখে দেখছে কেউ কেউ। যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। তাই ভয়ে ভয়ে আছে। ভয় হতেই পারে। লুঙ্গি পাঞ্জাবী টুপি পরে মুখে চাপ দাড়ি নিয়ে কেউ শরণার্থী হয়েছে এমন অন্তত আমার চোখে পড়েনি। ওদের কাছে শুনলাম কাদেরকে এক মাসের জেল দিয়ে আলীপুর জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বনগাঁয় তখন লোক ধরে না। একেবারে উপচে পড়া অবস্থা। কি শহর, কি গ্রাম, কি হোটেল, লোকে লোকারণ্য! পাল্টে যাচ্ছে জীবনযাত্রা। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ঘিরে গোটা পশ্চিম বাংলার জীবন যাত্রায় নাড়া লেগে গেছে। জানা গেলো থানার বড় দারোগা কাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পেরেছে সে বাঙ্গালী। তাই তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী গুপ্তচর হিসেবে কেইস না দিয়ে 'বিনা পাসপোর্টে ভারতে প্রবেশ' এই অভিযোগ এনে থানা থেকে কোর্টে চালান করে দিয়েছে। বিনা উকিলে ইতোপূর্বে দুবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। দোষ স্বীকার করেনি বলে আবার তারিখ দিয়েছে। কোর্টে কাদের নিজেই বিচারককে বলেছে, সে মুক্তিযুদ্ধ করতে ভারতে

এসেছে। ভারতে এসে সে কোনো দোষ করেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন প্রাণ বাঁচাতে ভারতে এসেছে সেও তেমন এসেছে। এখানে পাসপোর্টের প্রয়োজন কারো পড়েনি। পরে জেনেছি ওর ধারণা হয়েছিলো দোষ স্বীকার করলে সে দাগী অপরাধী হয়ে যাবে। সে দোষ স্বীকার করেনি। বিজ্ঞ বিচারক ২/১ দিনের জেল দিয়ে তাকে ছেড়েও দিতে পারেননি।

ওরা দুঃখ করে বললো, বাংলাদেশ হতে ভারতে এসেছে এমন কোনো একজন হিন্দু ব্যক্তি যদি সনাক্ত করে বলতো যে, সে কাদেরকে চেনে, সে বাঙ্গালী, তাহলে আর কিছু লাগতো না, এমনিতে কোর্ট তাকে ছেড়ে দিতো। কিন্তু চেনা জানা কেউই এ কাজ করে দিতে রাজী হয়নি। নানা ছলছুতোই এড়িয়ে গেছে। অনেকে আবার এমন ভাব দেখিয়েছে যেন চেনেই না! অনেক চেষ্টা ওরা করেছে। কোনো কাজ হয়নি। কাজেই আজই ওরা দেশে চলে যাচ্ছে বলে আমাকে জানালো এবং আমি যাবো কিনা জানতে চাইলো। বললাম, আমি কোথায় যাবো ঠিক নেই, তোমরা যাও।

মনটা খারাপই হয়ে গেলো। এ দেশের মানুষ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, মিলেমিশে ভালই ছিলো। কূট চরিত্রের অধিকারী ইংরেজ এ দেশে এসে ধর্মকে ব্যবহার করে দুই শত বছর শোষণ করে গেলো।

কৌশলে তারা হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিলো। বীজ বুনে দিলো সাম্প্রদায়িকতার।

আবার যাবার সময় একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকের সহযোগিতায় ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করে গেলো ভারতবর্ষকে। পূর্ব বাংলার মানুষ আর বাঙ্গালী থাকলো না, হয়ে গেলো পাকিস্তানী। এক হাজার মাইল দূরের উর্দুভাষীদের সাথে আমরা এক হয়ে গেলাম। সেই এক হবার কি মূল্য আজ সবার কাছে স্পষ্ট। তাই আমাদের কাছে একটাই প্রেরণা উর্দুভাষী পাকিস্তানীদের হটাতে হবে। সেই পাকিস্তানীদের হটাতে যেয়ে যতোরকম সাহায্য প্রয়োজন ভারত তা করেছে এবং সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের ভারতে যাওয়া। ভারতে যেয়েও দেখা গেলো বৃটিশদের রেখে যাওয়া বিষাক্ত সেই গ্যাসে এখনো আমরা কেমন আক্রান্ত হয়ে আছি।

বনগাঁয় প্রথমবার যারা আমাকে দেখেছিলো, যাদের সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় চায়ের দোকানে হয়েছিলো দ্বিতীয়বার আমাকে দেখে তারা ধরে নিয়েছে আমি ট্রেনিং শেষ করে এসেছি। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তারপর বড় কথা আমি কোনো ধান্ধাবাজির আশায় ঘুরছি এটা যখন তারা ভাবেনি তখন চলাফেরা করতে আমার কোনো অসুবিধা হলো না।

আমি লক্ষ্য করেছি সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের সময় সাধারণ মানুষ যারা দেশ ছেড়েছে, রিফিউজি হয়েছে, তারা বেশীর ভাগ বর্ডার এলাকার বাসিন্দা। ও পারের এই সব হিন্দুরা তাই এ পারের মুসলমান দেখলে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। তারা মনে করে এসব নেড়েদের জন্যেই তাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। আবার এ পারের মুসলমানেরা ঐ সব হিন্দুদের দেখলে একইভাবে তাকায়। মনে করে ঐ সব মালাউনের জন্য আজ তাদের এই অবস্থা। কিন্তু এর জন্যে প্রকৃতপক্ষে কারা দায়ী সে উপলব্ধি তাদের নেই, থাকার কথাও না। আমি বিভিন্ন মানুষের সাথে আলাপ করে যা

বুঝেছি, এবার বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তারা বাপ-দাদার ভিটেয় ফিরে যেতে পারবে বলে আশা করে।

শরণার্থী শিবিরে যেয়ে অনিতাদের কোন খোঁজ পেলাম না। কেউ বলতেও পারলো না ওরা কোথায় আছে। প্রথমে যে শিবিরে ওরা উঠেছিলো সেখানে গিয়ে শুনলাম সেটা ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থা। কয়েকদিন পরই ওরা অন্য ক্যাম্পে চলে গেছে অথবা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাঁটাঘাঁটি করলে খোঁজ ঠিকই পাওয়া যাবে কিন্তু কি লাভ ? কত অনিতারা কোথায় চলে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে সে শুধু ভবিতব্যই বলতে পারে। তবু মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আমার মন কখনো সায় দেয় না। এখনো ছিলো না, অথচ মন স্বাধীনতা চায়, দেশের মানুষের মুক্তি চায়। পৃথিবীর সব দেশ আমার সোনার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিক, অনিতারা বাড়ি ফিরে যাক, মন চায়। তাহলে এখন কি করতে পারি ? মিটিং মিছিল জ্বালাও পোড়াও-এর সময় শেষ হয়েছে। এখন যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে হবে। সেই যুদ্ধ কবে শেষ হবে যেদিন পাকিস্তানীরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

এর জন্যে কত সময়ের প্রয়োজন হবে ? অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে ওদের তাড়াতে কত সময় লাগতে পারে ? দেশের মানুষ যদি ওদের কোন রকম সহযোগিতা না করে তা হলে কত সময় লাগতে পারে ? আর দুটোই যদি এক সাথে হয় তাহলে কত সময় লাগতে পারে ? দিন চলে গেলো রাত চলে গেলো। আমার ভাবনা ভাবনায় থেকে গেলো।

ইচ্ছে ছিলো আলীপুর যাবো। কাদেরের সাথে দেখা করা হবে, আলীপুর জেলখানাও দেখা হবে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক সময় এই জেলখানায় বন্দী ছিলেন। বৃটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে এখানে বন্দী করেছিলো। বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি রাজবন্দীর জবানবন্দী নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন, বাঁশীর সুরতো বাঁশীতে নয়, সুর তার মনে, যে বাঁশীটি বাজায়। কাজেই বাঁশী ভেঙ্গে ফেলে কোন লাভ হবে না। ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার সুর বেজে উঠেছে। সুতরাং কবিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে স্বাধীনতার দাবীকে স্তব্ধ করা যাবে না। সেই একই প্রেরণা কাজ করেছে আমাদের এ স্বাধীনতা যুদ্ধেও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলখানায় আটক করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্যে কবর খুঁড়েও সে সুর থামাতে পারেনি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। থামাতে পারেনি এক কোটি লোককে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেও। কারণ সুর যে তখন সৃষ্টি হয়ে গেছে কোটি মানুষের অন্তরে!

আলীপুর যাওয়া হয়নি, কিন্তু আলীপুর জেলখানার একটা ঘটনা কাদের আমাকে পরে বলেছিলো যা এখানে না বলে পারছি না।

জন্মভূমির প্রতি মানুষের যে একটা টান তার একটা ছোট্ট ঘটনা কাদের আলীপুর জেলখানা থেকে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলো। ঘটনাটা এই রকম: ওকে যখন বনগাঁ থেকে আলীপুর জেলখানায় পাঠানো হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে ওর নাম ঠিকানাও পাঠানো

হয়েছে। ওখানে জেলখানার যে ব্লকে ওকে থাকতে দেয়া হয়েছিলো সেটা ঐ জেলখানার নাকি সেরা ব্লক। ওখানে যারা থাকে জেলখানার ভেতরে তাদের প্রবল প্রতাপ। তাদের খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আরামআয়েশের কোন ঘাটতি নেই। শুধু তাই নয়, জেলখানায় থেকেও তাদের নগদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে। কাদের যখন কার্ড হাতে করে ঐ ব্লকে ঢুকেছে তখন তারা জানতে চেয়েছে কতো টাকা ঘুষ দিয়ে সে এই ব্লকে এসেছে। কাদের বলেছে সে ঘুষও দেয়নি, এ ব্যাপারে কারো সাথে কোনো কথাও বলেনি। এ কথা সে যতোই বলুক, ওরা তা বিশ্বাস করেনি। বলেছে, তা হলে এই জেলখানার কোনো অফিসার নিশ্চয় আপনার কিছু হন। শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করেনি যে, কিছু একটা ঘটনা ছাড়া তাকে ওখানে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা জানা গেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। ঐ জেলখানায় কয়েদীদের ব্লক বণ্টন করেন যে অফিসার, তাঁর বাড়ি আমাদের পাশের খানপুর গ্রামে। পাশের গ্রাম হলেও আসলে এপাড়া ওপাড়া। দেশ বিভাগের সময় ওঁরা ওপার চলে যান। এক ভাই রয়ে যান এপার। কাগজপত্রে কাদেরের নাম ঠিকানা দেখে সেই ভদ্রলোক করেছিলেন কাজটি। শিকড়ের টান তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি।

ফিরে এলাম যশোর রোড ধরে।

১৮

যশোর ফিরে এসে খবর পেলাম বোড়ন সাফদারপুর, বড় ভায়রাদের বাড়িতে। কোটচাঁদপুরের পরের স্টেশন সাফদারপুর। বড় ভায়রা নাকোল গিয়েছিলেন, পরিস্থিতি দেখে বোড়নকে নিয়ে গেছেন। ছোটবেলায় পলিও রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এমনিতে বোড়নের চলতে একটু অসুবিধা, তারপর পেটে সন্তান নিয়ে ইতোমধ্যে কয়েকবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। সুতরাং, তাঁর বিবেচনায় এই অবস্থায় বোড়নকে আর নাকোল রাখা যায় না। কোটচাঁদপুর থেকে ট্রেনে ছাড়া সাফদারপুর যাওয়া, বিশেষ করে বর্ষাকালে কোনোভাবে সম্ভব নয়। সাফদারপুর এলাকার একটি ছোট বাজার। রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই বাজার। এখান থেকে নিরাপদ রাস্তা চলে গেছে সীমান্ত পর্যন্ত। ভালো কোনো রাস্তা না থাকলেও গ্রামের পথে পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায় সহজে।

আমি যখন কোটচাঁদপুর পৌঁছলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। আর কোন ট্রেন নেই। সুতরাং আজকে আর যাওয়া হবে না। কোটচাঁদপুর গেছি বাসে। কোটচাঁদপুর সামনে

রেখে সলেমানপুর গ্রামের মোড়ে রাজাকাররা বাস থামিয়ে দিলো। যার কাছে যা আছে চেক করছে। যাকে ওদের দৃষ্টিতে সন্দেহ হচ্ছে তাকে নামিয়ে নিচ্ছে। রাইফেল ঘাড়ে সংখ্যায় তিন চার জন। একজন যাত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি হলে তার ব্যাগটি রাজাকাররা নামিয়ে নিয়েছে। যাত্রীটির বক্তব্য, ব্যাগ রেখে দেওয়া হলো তো তাকে একটা টোকেন দেওয়া হোক! শিক্ষিত মানুষ বোঝা গেলো। টোকেন হলো কোন কিছু জমা রাখলে তার স্বীকৃতিস্বরূপ কিছু একটা দেওয়া, যেমন আমরা ব্যাংকে টাকা ওঠানোর জন্যে চেক জমা দিলে একটা টোকেন দেয়। টোকেন কি জিনিষ রাজাকারদের তা বোঝার কথা নয়। লোকটাও পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারেনি। টোকেন চাওয়াতে একজন রাজাকার রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করলো লোকটাকে। 'মাগো' বলে লোকটা মাটিতে পড়ে গেলো। ২/৩ জন ধরে টেনে হেঁচড়ে তাকে নিয়ে গেলো। বাসের যাত্রীরা একে অপরের দিকে তাকানো ছাড়া কিছুই করতে পারলো না।

স্কুল জীবনের শেষ দুটো বছর আমি কোটচাঁদপুর হাই স্কুলে পড়েছি। এই স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে রবিউলের কথা আগেই বলেছি। আর একজনের কথা এখানে এসে বলতে হচ্ছে তার নাম বগা। আসল নাম ওয়ালিউর রহমান। ওর কাছে রাত্রে থাকলাম। অনেক কথা অনেক রাত অবধি চললো। ও বাসায় থাকে না, ঘটনাক্রমে আজ বাসায় আছে। ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ওর বিষয় সাধারণ ইতিহাস। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা, নিজের চোখে দেখা, বিশেষ করে রাজাকারদের ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু ওকে শুনালাম। ও বললো, এখানেও ওরা প্রতিদিন মানুষ খুন করছে, গরু ছাগল ধরে এনে প্রকাশ্যে জবাই করে খাচ্ছে, মানুষ ধরে এনে জিম্মি করে টাকা আদায় করছে, নারী অপহরণ, ধর্ষণ নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে। তবে আশার কথা হলো জনসাধারণের সার্বিক অসহযোগিতায় ওরা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়বে বলে আমি মনে করি।

সকালে আমরা আমাদের স্কুলের দিকে গেলাম। এই স্কুল ঘর এক সময় নীলকুঠি সাহেবদের আঞ্চলিক দপ্তর ছিলো। দোতলা চৌকো বিল্ডিং, সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। কপোতাক্ষ নদীর বাঁকে বড় মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই স্কুল। স্কুলের সামনে খেলার মাঠটি এতো সমতল ও মসৃণ ছিলো যে, ক্রিকেট খেলার মাঠ হিসেবে এটা আমাদের গর্ব ছিলো। আমাদের আর একটা গর্ব ছিলো, আমরা প্রধান শিক্ষক রাজেন বাবুর ছাত্র। সর্বজনশ্রদ্ধেয় আমাদের এই স্যারের কর্ম জীবনের শুরু এবং শেষ এই স্কুলের শিক্ষকতা করেই। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো শিক্ষকের চেয়ে তিনি ভাল পড়াতে পারতেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি যশোর জজ কোর্টের জুরী বোর্ডেরও মেম্বার ছিলেন। ধুতি পাঞ্জাবী আর বাম কাঁধের ওপর ভাঁজ করে রাখা চাঁদর ছিলো স্যারের পোশাক। বার মাস তিনি ছাতা ব্যবহার করতেন। কোটচাঁদপুর লাগোয়া সলেমানপুর গ্রামের নিজ বাড়ি হতে পায়ে হেঁটে তিনি যাতায়াত করতেন। ১৯৬৫ সালে আমরা যখন স্কুল পাড়ি দিয়ে আসি তখন স্কুলের প্রায় সকল শিক্ষকই স্যারের ছাত্র।

বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এমন একদিন স্যার আমাদের ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে গেলেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে আমি স্যারের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেছি। স্যার টের পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পেছন ফিরে বল্লেন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়।' স্যার চলে গেলেন দোতলার লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে। আমি চেয়ে রইলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যতোবার আমি বৃষ্টি অনুভব করি ততবারই স্যারকে অনুভব করি।

একাত্তরে সর্বজনশ্রদ্ধেয় সেই স্যারও মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে একেবারেই দেশ ছেড়ে চলে যান। শুনেছি খুব কষ্ট করে টিউশনি করে জীবন যাপন করেছেন। এখানেই শেষ হয়নি, পরবর্তী সময়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্ধ হয়ে ভিন দেশে বসে বসে তিনি নিশ্চয় আমাদের কথা ভেবেছেন। ভাবতে বড় কষ্ট হয়।

মাঠের কাছে আমরা যেতে পারলাম না। এই মাঠ ক'দিন আগেও ছিলো শরণার্থীদের ট্রানজিট ক্যাম্প। সারা মাঠ প্যাক কাদা। কোথাও এক দুই ফুট মাটি উঁচু হয়ে আছে, কোথাও সমপরিমাণ গর্ত হয়ে আছে। এর মধ্যে মানুষ ছিলো এ দৃশ্য যারা না দেখেছে তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। মনে করবে এটা একটা বিশেষ প্রাণীর বাথান ছিলো। জিজ্ঞেস করলাম; কিরে এতোবড় একটা স্কুল বিল্ডিং থাকতে মাঠটার এই অবস্থা কেন ? ও যা বললো, তাতে শুধু স্কুল মাঠ কেন, সামনের ঐ আম বাগানেও শরণার্থীদের থাকার সংকুলান হয়নি। এই পথে অসংখ্য মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে গেছে। তখন একশ্রেণীর মানুষ তাদের সেবা করেছে, এখন আবার একশ্রেণীর লোক যারা সেবা করেছিলো তাদের খুঁজছে। কথায় কথায় ও আমার দিকে তাকায়। ওর তাকানোটা বড় সুন্দর আর অর্থপূর্ণ। ইতিহাসের ছাত্র, তাই হয়তো চোখেই কিছু বোঝাতে চায়। এক সময় বিদায় নিয়ে ট্রেন ধরে সাফদারপুর পৌঁছে গেলাম।

আমার ভায়রা মোহাম্মদ আলী খান এলাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এলাকার লোক তাঁকে দীর্ঘদিন তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করে আসছে। তাঁর পিতাও এলাকার জনপ্রতিনিধিত্ব করেছেন দীর্ঘকাল। শুনলাম তাঁর কার্যাকলাপের প্রতি, এমন কি তাঁর বাড়িতে কে আসে কে যায়, তার প্রতিও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। সকাল হতেই ডাক পড়লো। রাজাকাররা এসে গেছে বাজারে। তারা জানতে চায় গতকাল এ বাড়িতে কে এসেছে। বাড়িটিও সকলের চোখে পড়ার মতো। এখানকার একমাত্র দোতলা বাড়ি। ভাই সাহেব মানে বড় ভায়রা এসে আমাকে ডেকে বললেন, মান্নান এসো, ওরা তোমার সাথে কথা বলতে চায়। বৈঠকখানার বারান্দায় গিয়েই দেখি ৪/৫ জন সশস্ত্র রাজাকার। বললাম, বলেন, কি জানতে চান আপনারা? তারপর নাম কি, করেন কি, কেন এসেছেন, মোহাম্মদ খান সাহেব কি হন ইত্যাদি প্রশ্ন। বল্লাম, আসেন, বসে কথা বলি। তারপর প্রায় আধা ঘন্টা কথা হলো, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। দেখলাম, বোড়ন যে এখানে আছে তাও তারা জানে। ভাবলাম, তাকেও আবার হাজির হতে বলে কিনা। যা হোক, ততোদূর না গড়ালেও তার এখানে আগমনের হেতু ব্যাখ্যা করতে হলো। ঢাকা থেকে এসেছি জেনে এক পর্যায়ে ঢাকার খবর জানতে চেয়ে বসলো। একটু হেসে বললাম, রাজাকারদের জোরদার ট্রেনিং

চলছে দেখে এলাম। রাজাকার বাহিনীকে রেগুলার ফোর্স হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে সরকারের। মনগড়া এ সব কথা বলার জন্যে নিজের কাছে খারাপ লাগলেও জানোয়ারদের হাত থেকে এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।

বাজারের সবাই মোটামুটি আমাকে চেনে। দোকানে বসে চা খাই, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করি। জায়গাটিও আমার খুব পছন্দ। কোটচাঁদপুর স্কুলে পড়াকালীন সহপাঠী আইয়ুবের সাথে অনেকবার এসেছি এই স্টেশনটিতে। ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশন। নিঝুম পল্লীর নীরবতা ভঙ্গ করে ঝিক ঝিক শব্দে ট্রেন যায়। আমাকে মুগ্ধ করে। যেনো তারাশংকরের 'কবি' উপন্যাসের সেই গ্রাম্য রেল স্টেশন, সেই বাজার। কখনো কখনো লাইনের বাঁকে তাকালে মনে হয় ঐ বুঝি হন হন করে রেল লাইন ধরে এগিয়ে আসছে ঠাকুরঝি, মাথায় তকতকে সাদা একটা বড় দুধের ঘটি। রোদে ঘটিটি দূর থেকে চিক চিক করছে আর সেই উপন্যাসের নায়ক নিতাই বুঝি এই বাজারেই কোথাও তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে!

সন্ধ্যার দিকে বাজারে গেলাম। দুই একটা দোকান তখনো খোলা আছে। দু'একজনের সাথে কথা হলো। বাজারের এক কোণায় একটা চায়ের দোকান। ঐ দোকানে কাজ করে সুরুজ, তেরো চৌদ্দ বছরের এক বালক। সারাক্ষণ গান গায়। তখনো বেঞ্চের পরে শুয়ে শুয়ে আপন মনে গেয়ে চলেছে, "সালাম সালাম হাজার সালাম..."। আমাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠলো, কাঁধের গামছা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেঞ্চখানা মুছে আমাকে বসতে দিলো। অন্য দোকান থেকে চা এনে খাওয়াতে চাইলে আমি না করলাম। বললাম, বসো, তোমার সাথে কথা আছে। জানতে চাইলাম সকালে বাজারে কি ঘটনা ঘটেছিলো। রাজাকাররা সারা বাজার খোঁজাখুঁজি করছিলো কি কারণে? আজ সকালে আমার সাথে কথা শেষ করে এসে তারা বাজারে তল্লাশি চালায়। আমি কিছু আন্দাজ করতে পারলেও সারা দিন এ ব্যাপারে কারো সাথে কোনো কথা বলিনি। তাই সুরুজের কাছেই জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি। সুরুজ একটু কাছে সরে এসে গলা নিচু করে বললে, দুলাভাই, খুব সাবধান, কেউ যেনো শোনে না। কারা যেনো মাঝে মাঝে রাতের বেলায় বাজারে খবরের কাগজ রেখে যায়। আমি তো পড়তে পারিনে, শুনেছি, ওটা নাকি স্বাধীন বাংলার কাগজ! মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে ঐ কাগজ রেখে যায়। ২ দিন আগে একবার রেখে গেছে। রাজাকাররা ঐ কাগজ দোকানে দোকানে খোঁজ করে। ওরা বলেছে, কারো দোকানে যদি এই কাগজ পাওয়া যায় তবে তাকে ওরা গুলি করে মারবে। কেউ কিছু জানলেও মুখ খোলে না। বললাম, তুমি কি আমাকে ঐ কাগজ দেখাতে পারো? আমাকে বসতে বলে সে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো হাতে ভাঁজ করা ছোট (টেবলয়েড) সাইজের একখানা পত্রিকা। আমার হাতে পত্রিকাখানা তুলে দিয়ে আমাকে আবারো সাবধান করে দিলো। কেউ টের পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! কাগজখানা অন্য এক টুকরা কাগজ দিয়ে মুড়ে ঘরে ফিরে এলাম। ওকে বলে এলাম সকালে দেখা হবে। ঘরে দরজা বন্ধ করে হারিকেনের আলোয় কাগজখানা মেলে ধরলাম। স্বাধীন বাংলার খবরের কাগজ 'জয় বাংলা'। তাড়াতাড়ি কাগজখানা ভাঁজ করে

একখানা ইংরেজী কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে আমার ব্যাগের ভিতর রেখে দিলাম। সমস্ত চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যেতে লাগলো। শরীর কাঁপতে লাগলো কি এক শিহরণে। এই পত্রিকা দেশের কতটুকু ভেতরে গেছে? এই শক্তিশালী অস্ত্রখানা কি ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে ? যারা এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে তাদেরই কি সব দায়িত্ব ? এখানকার লোকজনের কি কোনো দায়িত্ব নেই এই কাগজ দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে দেয়ার? এ রকম নানা কথা আমার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম মুক্তিযুদ্ধের এই মূল্যবান অস্ত্র আমি ঢাকায় নিয়ে যাবো।

পরের দিন সুরুজকে বলে আরো এক কপি জয় বাংলা নিয়ে নিলাম এবং ওকে বলে রাখলাম, যখনই এ কাগজ আসে তুমি অন্তত দুটো কপি আমার জন্যে লুকিয়ে রেখে দেবে। পারবে কিনা? খুব পারবো বলে কেমন যেনো পুলকিত হয়ে উঠলো তার চেহারা।

১৯

রওনা দিলাম আবার ঢাকার উদ্দেশে, সাথে জয় বাংলা পত্রিকা। এই কাগজ বহন করতে মিলিটারীদের নিয়ে তেমন কোনো ভয় নেই। ভয় রাজাকারদের নিয়ে। একটি ইংরেজী কাগজের ভেতরে ভাঁজ করে রেখে সুটকেসের মতো দেখতে ব্যাগের তলায় রেখে দিলাম। ঝিনাইদহ মিলিটারী ক্যাম্প। বাস থামিয়ে চেক করে। ইচ্ছা হলে কাউকে নামিয়ে রাখে। দৈত্যাকৃতি রোবোটের মতো গতি, এক মিলিটারী সাথে কয়েকজনকে নিয়ে বাসে উঠলো। বাসে লোক কম। লাইন দিয়ে এক এক করে ব্যাগ চেক করছে, শরীর চেক করছে। আমার কাছে এসে ইশারায় ব্যাগ খুলতে বল্লো। আমি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার চেষ্টা করছি। আমার তখন গোঁফ আছে, মাথা ভরা চুল চিরদিনের অভ্যাস মতো পেছনে একটু লম্বা। আরো ২/১ জন বাসের ভেতর উঠে এলো। আমার ব্যাগটা আকারে এখনকার ইকোলাক ব্রিফকেসের চেয়ে একটু উঁচু। রেক্সিনের তৈরী চেন টেনে ব্যাগ খুলে দিলাম। নিজেই কাপড়-চোপড় উল্টিয়ে দেখালাম। তাতে হলো না, নিজে ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলো। আমি দেখলাম খবরের কাগজে ওর হাত ঠেকলো। যে কাগজে লেখা আছে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রার কথা, কাদেরিয়া বাহিনীর কথা, আবু সাইদ চৌধুরীর বিশ্ব জনমত সৃষ্টির প্রয়াসে জেনেভায় দেয়া বক্তৃতার কথা। আমার তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর নির্মিত 'কিড এ্যামোং দি উলফ' ছবির একটি দৃশ্যের মতো অবস্থা। দৃশ্যটা এমন, লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে এক একজনের সামনে যাচ্ছে তার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াচ্ছে, তাকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারপর

আর একজনের কাছে যাচ্ছে। এর মধ্যে যার বুকে আঙ্গুল দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে তাকে অন্যরা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাত টিপে দেখে ইশারায় জানতে চাইলো হাতের তালুতে দাগটা কি জন্যে? বল্লাম, বার্নড্ চাইল্ডহুড। এই সময় আর একটা বাস এসে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলো। আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে ভারী পায়ে মেশিনগান ঘাড়ে বাস থেকে নেমে গেলো, আমাদের বাস ছেড়ে দিলো।

মাগুরায় রাজাকার। কামারখালী রাজাকার। ঢাকায় থাকি। কার্ড আছে। চাকরী করি। এ সব কথা বলতে বলতে ভেতরে আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে এক সময় গোয়ালন্দে পৌছে গেলাম। প্রতি মুহূর্তে ভয়, যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে চরম পরিণতি। বিকাল হয়ে গেছে। আরিচা ঘাটে ফেরি থেকে নেমে ইপি আর টি সি'র বাস ধরে ঢাকায় যেতে হবে। ফেরি ঘাটে ভিড়ে গেলো, তখনও বুঝিনি একটু পরেই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রক্তজমাট বেঁধে যাওয়ার মতো ঘটনা। আরিচা ঘাটে ইপি আর টি সি'র বাস ডিপোতে মিলিটারীরা ক্যাম্প করেছে তা আমার জানা নেই। ফেরি থেকে নেমে খুব দ্রুত পায়ে ঐ ডিপোর এরিয়ার মধ্যে মানে টিকিট কাউন্টারের সামনে দিয়ে যে টানা বারান্দা ছিলো সেখানে পৌছে গেছি। হল্টের মতো কি একটা বিকট শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি তিনদিক থেকে আমার দিকে রাইফেল তাক করা। সাথে সাথে হাতের ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে দুই হাত উঁচু করে ফেলেছি। তারপর অফিসার গোছের একজন আমার দিকে এগিয়ে এলো। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করে দিলাম। মরার আগে একবার চেষ্টা করে দেখা বাঁচা যায় কিনা। বললাম, আমি জানতাম যে, এই জায়গাটা আগের মতো ইপি আর টি সি'র বাস স্ট্যান্ড আছে, তাই টিকিট কেটে ঢাকায় যাবো বলে আমি এখানে এসেছি। আমি একজন চাকুরীজীবী মানুষ। ইংরেজী বলার কারণ উর্দু আমি বলতে পারি না। হাই হুই শুনে কিছুটা বুঝতে পারি। ভেতর থেকে একজন যা বলে উঠলো তার অর্থ আমি বুঝলাম, উজকো পাকড়াও এধারছে। ভিন্ন দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে এসে আমাকে ইশারা করলো চলে যেতে, আমি হাত নামালাম। ব্যাগটার দিকে তাকালাম। ঠারো! এ রকম একটা শব্দ হলো। আস্তে আস্তে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে ইশারা করে ব্যাগ খুলতে বললো। আবার ব্যাগ না খুলতেই ইশারা করে চলে যেতে বললো। আমি ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম এবং গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষা করতে করতে পা বাড়িয়ে দিলাম। এক সময় বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। নিজের কাছে নিজেই জিজ্ঞেস করলাম, আমি বেঁচে আছি কিনা!

তারপর ঢাকায় পৌছানো পর্যন্ত আমি যে কি করেছিলাম, কিভাবে ঢাকায় পৌছেছিলাম। সেই দিন পৌছেছিলাম না তার পরদিন পৌছেছিলাম এর খুঁটিনাটি এখন আর মনে করতে পারি না। ২৬ বছর আগের ঘটনা। স্মৃতি থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছি না

শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর শান্তিনগর বাসার গেইট খুলে দিয়েছিলো বাসার ছেলেটা। নাম আলী। তখন অনেক রাত।

আমাকে পেয়ে আলীর কথার শেষ নেই। আমি কয়েকদিন থাকবো কিনা, যদি থাকি সে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বাড়ির কথা বলে। বড় রাস্তার ধারে বাড়ি বলে বাড়িঘর ছেড়ে ভেতরের দিকে চলে গেছে বাড়ির সবাই। বললাম, কাঁদিসনে সবখানেই এক অবস্থা। তাছাড়া আমি কালই চলে যেতে পারি ঠিক নেই।

পরের দিন সকাল ৯টার দিকে ওর সাথে কথা। জানতে চাইলাম, বাজারে পুলিশ-মিলিটারী আছে কেমন। পুলিশ মিলিটারীর কোন খবর নেই। চারদিকে রাজাকাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে রেডিওতে, কেউ স্বাধীন বাংলা শুনলে তার রক্ষা নেই। ওরা বাসায় বাসায় এসে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছে বলে সে জানালো।

বললাম, ঠিক আছে এখন যাও, দেখে এসো বাজারে রুনুটি চায়ের দোকানটা খোলা আছে কিনা। চা বানায় না, গুঁড়ো চা বিক্রি করে যে দোকানটা। ও চলে গেলো। বাসায় আমি একা। মনা ভাই নারায়ণগঞ্জে তাঁর কর্মস্থলে, অন্যেরা মানিকগঞ্জে মেয়ের বাসায়। ভাবলাম এই ছেলে একা কিভাবে বাসায় থাকে। এই ভাবে ওকে রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি। একটু পরে ছেলেটা এসে খবর দিলো, খোলা আছে। আমি দেরী না করে একখানা পত্রিকা নিয়ে এমনভাবে ভাঁজ করলাম যে, প্রথম পৃষ্ঠার ওপরের অংশ দেখা না যায়। এক টাকার চা দিতে বলে কাগজখানা দোকানে রেখে পকেটে টাকা খুঁজতে লাগলাম। চায়ের ছোট্ট ঠোংগাটা দোকানী রাখতেই আমি টাকা দিয়ে পত্রিকাখানা রেখে মুহূর্তের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ভিন্ন রাস্তায় বাসায় ফিরে এলাম। ঘরে কত চা নষ্ট হচ্ছে, আবার আমি কেন চা এনেছি, ছেলেটার এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বাকী কাগজখানা একইভাবে ভাঁজ করে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শান্তিনগর থেকে বাসে ওঠার সময় কাগজখানা হাতে নিলাম। কাকরাইল ছেড়ে বসার জায়গা পেয়ে বসে পড়লাম। উদ্দেশ্য, কাগজখানা কোনো জনবহুল জায়গা দেখে ফেলে দেওয়া। যতক্ষণ জানালার ধারে বসতে না পারছি ততক্ষণ কাজটা করা যাবে না। জিপিওর সামনে যেয়ে সে সুযোগ এসে গেলো। গুলিস্তানের দিকে বাস মোড় নিতেই জানালা দিয়ে কাগজখানা এমনভাবে ফেলে দিলাম যেন হাত ফসকে পড়ে গেলো। ২/১ জন লক্ষ্য করায় বললাম, আরে, কাগজটা পড়ে গেলো! যাক, ওটা এমন কিছু না। তারপর উঠে যেয়ে বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং গুলিস্তানে বাস থামার আগেই নেমে গেলাম। হৃষ্ট চিত্তে ফিরতি বাসে শান্তিনগর ফিরে এলাম। যেন যুদ্ধ জয় করে ঘরে ফিরলাম! জয় বাংলা পত্রিকা ঢাকায় আনতে পেরেছি এই কথা ভেবে গর্বে আমার বুক ভরে উঠতে লাগলো। সে আনন্দ একান্ত আমার নিজেরই রইলো। কাউকে বলা গেলো না।

২০

শান্তিনগর মোড়ে মনা ভাইয়ের বন্ধু জামান সাহেবের সাথে দেখা। মনা ভাই বাসায় আছেন শুনে বাসায় এলেন। মাঝারি গোছের আমলা তিনি। আমাকে বেশ স্নেহ করেন। কিছু কথা বলার সুযোগ ছাড়া যায় না। আমি এখন কি করছি এ কথার উত্তরেই মনের কথাগুলো বলে ফেলি। বললাম, কিছুই না, শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এর মধ্যে ২ বার ভারতে গেছি, শীঘ্রই আবার যাবো। এবার যেয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে যুদ্ধে যাবো। হাসান ভাই রসিকতা করে বললেন, তুমি যুদ্ধ করতে গেলে তোমার রাইফেল উঁচু করে ধরার জন্যে আর একজনকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। বললাম, ঠাট্টা করবেন না হাসান ভাই, আমার মতো বহু মরাধরা বাঙ্গালী এবার স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। দেখেন এবার তারা কেমন মারটা দেয় পাকিস্তানী 'গাবুরগো'। যারা গেছে তারা জানে ওদিকে কি ঘটছে। আপনারা না যেয়ে বরং দেশের সাথে বেইমানি করছেন। দেশ স্বাধীন হলে আপনাদের ক্ষমা করা হবে না। আর দেশ যে স্বাধীন হবে সেটা আমার চেয়ে আপনার ভালো জানা থাকার কথা। হাসান ভাই কপাল একটু কুঞ্চিত করে বললেন, স্বাধীন যে হবেই তা তোমাকে কে বলেছে, শুধু ভারত পাকিস্তানের ইচ্ছা মতো দুনিয়া চলে না। এক কোটি মানুষ ভারতে চলে গেছে আবার ফিরে আসবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া ধরো, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলো, তুমি বলছো, আমাদের ক্ষতি হবে। আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। দেশ চালাতে আমাদের প্রয়োজন হবে। মুক্তিযোদ্ধারা কেউ সিভিল প্রশাসন পরিচালনার ট্রেনিং গ্রহণ করছে এমন কথা এখনো শোনা যায়নি। জামান ভাই যে আমার সাথে এতোগুলো কথা বলবেন আমি আশা করিনি। মনা ভাই এসে পড়লেন, আমিও জামান ভাইকে একটা সালাম দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমলা আমলাই। সব সময় একটা সিস্টেমের দোহাই দিয়ে যা করার তাই করে যায় এবং এখনো গুটি কয়েক বাদে তাই করে চলেছে। জানি না দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সরকার আবার এদেরই খুঁজে এনে মখমলের মোলায়েম চেয়ারে বসাবে কিনা।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের উত্তরে রাস্তার মোড়ে প্যারামউন্ট নামে যে কনফেকশনারীর দোকানটা দেখা যায় ওটা তখনো ছিলো। ওখানে গেলাম কিছু খাবো বলে। দেখি মণ্ডল বাবু পাউরুটি কিনে দাম দিচ্ছেন। সালাম দিতে তিনি এমনভাবে কেঁপে উঠলেন যে, হাত থেকে মানিব্যাগটা পড়ে যাবার মতো অবস্থা। মণ্ডল বাবু একজন আমলা। এজি অফিসের একজন বড় কর্মকর্তা। নিজেকে লুকিয়ে ছাপিয়ে হয়তো ঢাকায় থাকছেন অথবা কোন জরুরী কাজে আসতে বাধ্য হয়েছেন। চেনা জানা কেউ দেখে ফেলুক সেটা চান না। তাই আমাকে দেখে হয়তো নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারেননি। সেই ছোট্ট ঘটনাটি আজো আমার মনে দাগ কেটে আছে। কি পরিমাণ ভয় পেলে একজন মানুষ এমন করতে পারেন তা আমি বুঝি। এমনো দেখেছি নাম হয়তো হরিপদ কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে অবস্থা বুঝে জীবনটাকে বাঁচানোর জন্যে বলে দিয়েছে নাম সোলেমান। জীবনের কাছে ধর্ম গৌণ

হয়ে গেছে। জীবন যে ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কারের উর্ধ্বে তা তখন বোঝা গেছে। তাই আমিও সেদিন আর কোন কথা বলিনি, বরং দ্রুত দোকান থেকে সরে গিয়েছিলাম।

পরের দিন ঢাকা থেকে রওনা হবার আগে শান্তিনগর বাজারে গেলাম। বাজারের ভেতর জলখাবার নামে যে রেস্টুরেন্টটা ছিলো তা এখন দুমড়ে মুচড়ে আছে। বাইরে বেঞ্চ পাতা একটা চায়ের দোকানে চা খেতে বসলাম। আসল উদ্দেশ্য জয় বাংলা পত্রিকার খবর জানা। বেশ কিছু সময় বয়ে গেলো। চা খাওয়া শেষ হলো। আর দেরী করা যায় না। এক ফাঁকে দোকানীর কাছে জানতে চাইলাম, বাজারে নাকি কি নতুন খবরের কাগজ এসেছে, স্বাধীন বাংলার কাগজ ? সাথে সাথে সে বলে উঠলো, না, না, আমি কিছু জানি না। বুঝলাম সে এড়িয়ে যেতে চাইছে। বললাম, না এমনিতে। কথাটা শুনলাম তো তাই। আগামী কাল বাড়ি চলে যাবো, তাই ভাবলাম খবরটা ঠিক কিনা জেনে যাই। তখন ও জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাড়ি কোথায় ? বললাম, যশোর। এভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা। আলাপ অনেকটা জমে আসে। আরো এক কাপ চা খেতে হলো। এক সময় সে বললো, স্বাধীন বাংলার কাগজ বাজারে এসেছে এ কথা সবাই জানে। আমি আর কিছু জানার প্রয়োজন মনে না করে উঠে পড়লাম।

২১

মানিকগঞ্জে টুকুর বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে সে একই স্বভাবে বলে উঠলো, ও তুমি? এতো ঘোরাঘুরি কি জন্যে? পথে ঘাটে মরার স্বাদ জেগেছে বুঝি? কোনো কথা না বলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। বুবু বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো? বল্লাম, আমি ভালো আছি বুবু। অনেক কথা হলো। পারিবারিক বলে এখন আর কিছু নেই, সবই সময়ের কথা। টুকুই কথাটা খুলে বল্লে, তার নানা মানে আমার দুলাভাই ফুপাতো বোনের স্বামী, টুকুর নানা দিয়ানত আলী খানকে নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন। যেভাবেই হোক আমি যেন যাত্রাপুর যাই। যাত্রাপুর যশোরের কালীগঞ্জ থানায়। দুলাভাই এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তি আর অনেক তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তির এখন বেশী সমস্যা। তাঁরা এক সময় মুসলিম লীগ করতেন। চিহ্নিত বলে কোনো দলে যেতে পারেন না। আওয়ামী লীগকে তাঁরা সাপোর্টও করেন না। অনেকে আবার 'পিস' কমিটির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। দুলাভাইকে নিয়ে অবশ্য তেমন কোনো ভয় নেই। বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে তিনি অনেক দূরে আছেন।

বারবাজার থেকে হাকিমপুর তাহেরপুর হয়ে যে কাঁচা রাস্তা ভারতে চলে গেছে, যে রাস্তার কথা আগেই বলেছি, সেই রাস্তার ধারে বারবাজার হতে ৬ মাইল পশ্চিমে যাত্রাপুর গ্রামে দুলাভাই দিয়ানত আলী খান সাহেবের বাড়ি। ১০ একর জমির ওপর বিশাল বাগানসহ তাঁর বাড়ি। বুবু ভেঙ্গে পড়েছেন কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। আমি যেন যে কোনোভাবেই হোক, তাঁকে ঢাকায় বা মানিকগঞ্জে এনে রেখে যাই। টুকুকে আস্তে করে বল্লাম, তোমার নানা যদি রাজাকারী করেন তা হলে তো ধরা খাবেই। তারপর হাসতে হাসতে বল্লাম, বুবুকে বলো আমাকে পাঁচ শত টাকা দিতে, ভাইকে এখানে এনে রেখে যাচ্ছি। আর তোমার কাছে যেটা পাওনা আছে সেটাও দিতে ভুলো না যেনো। টুকু জোরে একটা হাসি দিয়ে এক কাপ গরম চা এনে দিলো।

বুলবুল মানে ম্যানেজার সাহেব এলেন। তাকে বেশ চিন্তাযুক্ত দেখাচ্ছিলো। দুপুরে খেতে বসে অনেক কথা হলো। মুক্তিবাহিনী এসে গেছে, যতদূর সম্ভব সহযোগিতা দিতে হচ্ছে। অফিসে এসে একজন পরিচয় দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে গেছে। কখন কি অপরাধ ধরে বসে ঠিক নেই। বল্লাম, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তেমন কোন কারণ থাকলে অফিসে যেয়ে দেখা করতো না। মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করার কথা বলতো না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে ঐ ছেলেই সবার খবর রাখে কে কি করে। সাধারণ বেশে কাজ করে যাচ্ছে।

আবার রাজাকাররা যখন আসছে সাফাই গাইতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বুলবুলের ইচ্ছা আবার গ্রামের দিকে কোথাও চলে যাবে। সে মনে করছে এ ধরনের দ্বৈত ভূমিকা বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

আমি সকাল বেলা রওনা দিলাম। লোকজন কম, বাসও কম, কিন্তু মিলিটারী গাড়ির তৎপরতা প্রচণ্ড। দেখলে বোঝা যাচ্ছে ভারী যানবাহন অস্ত্রশস্ত্র আর রসদসামগ্রী বহন করছে। অন্য কোনো গাড়ি ফেরিতে উঠতে দিচ্ছে না। যে সব মানুষ ফেরিতে উঠছে তাদের আপাদমস্তক চেক করে ওঠাচ্ছে। লাইনে দাঁড় করিয়ে চেক করছে। রাজাকাররা তাদের সাহায্য করছে। কাউকে সন্দেহ হলে তাকে রাজাকারদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। তরা ঘাট পার হয়ে লাইন বাসে গেলাম আরিচা। ফেরি ভর্তি আর্মি আর ওদের ছোট বড় জলপাই রংয়ের গাড়িতে। ফেরি ছাড়তে বেশ দেরী হলো। যে কয়জন সাধারণ যাত্রী আছে সবাই এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে মনে হলো যেন কিছু বন্দীকে হাতে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি লাগিয়ে পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আলাপ করে চলেছে পাক সেনারা। পানি দেখে কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তেমন মনে হলো না।

কামারখালী ঘাটে এলাম। এখানেও লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে এক এক করে চেক করে ফেরিতে ওঠানো হচ্ছে। মিলিটারী গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি ফেরিতে ওঠার কোনো প্রশ্নই আসে না। এখানকার রাজাকাররাও খুব তৎপর। ফেরিতে না উঠে কয়েকজন মিলে নৌকায় পার হয়ে গেলাম কামারখালী ঘাট। দিন শেষ হয়ে এসেছে। একখানা ছোট্ট নৌকা করে নাকোল রওনা হয়ে গেলাম। নাকোল কামারখালী ঘাটে থেকে ২ বাঁক উজানে।

লক্ষ্য করলাম মাঝি বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। বুঝলাম সে কিছু একটা বলতে চায়। দু'একটা কথা বলতেই সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুক্তিযুদ্ধের খবর কিছু জানেন? শুনলাম, মুক্তিযুদ্ধের সাথে তারা কিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। তার এক ভাইকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে গেছে। বলেছে, রাজাকার বাহিনীতে যোগদান না করলে তাকে মেরে ফেলবে। এক ভাই বাড়ি থেকে চলে গেছে। মুক্তিযুদ্ধে গেছে সন্দেহে তার বুড়ো বাবাকে দুই দিন ধরে নিয়ে গেছে। মারাধরা করেছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে বলেছে। আমি কিছু সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লোকটা প্রায় কেঁদে ফেললো। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলো, শেখ মুজিব বেঁচে আছে কিনা? আমি অবাক হলাম না। শেখ মুজিব তো এই কারণেই শেখ মুজিব। কোটি মানুষের ভালোবাসার শেখ মুজিব। কিছু সময় নীরবে কেটে গেলো। নৌকা থেকে নামার সময় বললাম, শেখ মুজিব বেঁচে আছেন।

নাকোল গ্রাম প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। মহিলারা কেউ নেই বললেই চলে। আরো ভেতরের দিকে চলে গেছে। এমন সব গ্রামে চলে গেছে যেখানে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। রেজা মাস্টারের সাথে দেখা হয়ে গেলো। আরো কয়েকজন জুটে গেলো সেখানে। রেজা মাস্টারের কথা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। আগেই বলেছি, তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে লেখাপড়া করেছেন। গ্রাম্য এক হাই স্কুলের তিনি প্রধান শিক্ষক। নিরিবিলি জীবন। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। কথায় কথায় রেজা সাহেব বললেন, শেখ মুজিবকে ওরা হাতে রেখেছে। পরাশক্তির মাধ্যমে একটা আপোস রফার চেষ্টা পাকিস্তান করবে। আমি বললাম, এই পর্যায়ে এসে তা আর সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার কথা তিনি উড়িয়ে দিলেন না। বললেন, হয়তো তাই, এই পর্যায়ে এসে তা আর সম্ভব নাও হতে পারে। একজন বললেন, এভাবে আর কতদিন চলবে বলে মনে হয়? রেজা মাস্টার বললেন, তাই কি আর কেউ বলতে পারে ? মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা বলা যায়, শেষটা বলা কঠিন। পৃথিবীতে বর্তমানে কত দেশ কত জাতি মুক্তিসংগ্রাম করে যাচ্ছে। শেষ কবে হবে তা কেউ বলতে পারে না, তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবার সম্ভাবনা আছে। এক কোটি লোকের বোঝা ভারত বেশি দিন বইতে পারবে না। কিছু একটা ভারত সরকারকে করতেই হবে এবং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সে ক্ষমতাও রাখেন। কথার এক ফাঁকে রেজা সাহেব জানতে চাইলেন, মওলানা ভাসানী এখন কোথায় আছেন। তাঁর সেই জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও আন্দোলন এখন কোথায় গেলো। আমি একটু চুপ করে গেলাম। ঐ সময় পর্যন্ত আমার শুধু জানা ছিলো তিনি ভারতে চলে গেছেন। পরে জেনেছি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে তিনি আসাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। দেরাদুনে অবস্থান কালে চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং এবং প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই শুধু নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকেও তিনি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠান। তিনি বলেন যে, স্বৈরাচারী একনায়ক ইয়াহিয়া বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে যে অস্ত্র দিয়ে সেই অস্ত্র পাকিস্তানকে সরবরাহ বন্ধ করুন।

পরে চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লীতে থাকাকালীন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর একান্তে সাক্ষাত হয়। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

মওলানা ভাসানীকে ভারতে গৃহবন্দী রাখা হয়েছিলো এমন কথাও শোনা গেছে।

২২

নাকোল বাজারে পিরুর সাথে দেখা যার কথা আগেই বলেছি। দেখা মাত্র একেবারে উষ্ণ আলিঙ্গন। মার্চের পরে এ দেখার তাৎপর্যই আলাদা। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তরে বললাম, কি আর করবো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বলা যায়। শরণার্থীদের সাথে দু'বার ভারতে যেয়ে ঘুরে এসেছি। এবার ২/৪ জনসহ যেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবো ভাবছি। অবশ্য সে সুযোগ যদি ওরা দেয়। শুনছি এখন ভারতে যেয়ে চাইলেই যে কেউ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পারছে না। নানাদিক দেখে শুনে মুক্তিবাহিনীতে নেয়া হচ্ছে। নানাদিক মানে ? বললাম, সে কথা পরে শুনো, এখন ওঠো। পিরু বললে, তুই আমাদের সাথে আয়। সবাই একসাথে কাজ করা যাবে। মরিতো সবাই এক সাথে দেশের মাটিতে মরবো। ডুমাইনে আমরা ক্যাম্প খুলেছি। সোহরাবকে তো তুই চিনিস। ভাল নাম শেখ নজরুল ইসলাম, সেই আমাদের কমান্ডার। বললাম, তা হলে তো ভালই হয়।

যে কথা সেই কাজ। বেলা তখন ১০-১১টা হবে যখন আমরা রওনা দিই। নাকোল বাজার থেকে অল্প দূরে গড়াই নদী। পার হলেই ডুমাইন গ্রাম, ডুমাইন ইউনিয়ন থানা বালিয়াকান্দি জেলা ফরিদপুর (এখন থানা মধুখালী)।

ডুমাইনের শেখ পরিবার বেশ বড় পরিবার। এই পরিবারের লোকজনই থাকে শান্তিনগর শচীবাসে। শচীবাসের এখন মালিকই এই পরিবার। যারা মেস করে থাকে তারাও এই পরিবারেরই কেউ না কেউ। কার্ফিউ ভঙ্গের মিছিলের কথা বলতে যেয়ে আগেই যাদের নাম বলেছি তারাও সব এই পরিবারের লোক।

শচীবাসেরই এক অংশে মনা ভাই থাকেন সে কথা আগেই বলেছি।

নাকোল থেকে ডুমাইন মাঝে গড়াই নদী। সন্ধ্যায় নাকোল ফিরে আসি সকালের দিকে আবার যাই। ট্রেনিং নিতে হলে বানিয়াকান্দি ঢোলজানি ক্যাম্প যেতে হবে। অস্ত্র চালনা ট্রেনিং নিতে আমার মন সায় দেয় না একথা আগেই বলেছি। ওরা বলে ট্রেনিং ছাড়া

যে কাজটা করা যায় তা হলো গুলির বাক্স বহন করা। বলেছি, সেটায় বা কম কিসের? যুদ্ধ জয় করতে গেলে তো সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এই এলাকায় চলাফেরা করে বেড়াতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না, কারণ আমাকে প্রায় সবাই চেনে। আমার শ্বশুর মোমিন হোসেন খান এলাকায় পরিচিত বয়োবৃদ্ধ একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কর্মজীবনে ছিলেন নায়েব। দ্বিতীয় কারণ বোড়ন নাকোল স্কুলে ছেলেদের সাথে পড়াশুনা করায় এলাকার যুবশ্রেণী যারা লেখাপড়া করেছে বা কয়েক ক্লাস পড়ে আর পড়েনি তারা আমাকে শুধু চিনেই না, আমি রীতিমত তাদের দুলাভাই।

এদিকে সাফদারপুর বাজারের চা দোকানের সেই কিশোর বালক এতদিনে নিশ্চয় জয় বাংলা পত্রিকা রেখে দিয়েছে আমি যখন যাবো আমাকে দেবে বলে। জীবন বাজি রেখে সে কাজটা করতে পারবে আর আমি যেতে পারবো না তা হয় না। আমাকে দেখলে যে গর্বের হাসি তার মুখে ফুটে উঠবে সেই হাসিই তো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ! আমি তাকে বলে এসেছি, আমি আসবো। তুমি ঐ পত্রিকা বাজারে আসলে আমার জন্যে রেখে দেবে। এবং খুব সাবধানে রাখবে। এ কাজ করতে যেয়ে ধরা পড়লে কি পরিণতি হবে তা তুমি জানো। যার কাছে পাওয়া যাবে তার জীবনটাই শুধু যাবে না, এই সাফদারপুর বাজার আর বাজার থাকবে না, কয়লা হয়ে যাবে।

আবার মানিকগঞ্জে বুবুকে বলে এসেছি যাত্রাপুর যাবো এবং যদি সম্ভব হয় দুলাভাইকে মানিকগঞ্জে পৌঁছে দেবো। দুলাভাইয়ের খবর জানার জন্যে তারা আমার অপেক্ষায় থাকবে এটা উপেক্ষা করা গেলেও জীবন বাজি রেখে জয় বাংলা পত্রিকা নিয়ে যে কিশোর বালক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই একদিন সকাল বেলা নাকোল থেকে ডুমাইন না যেয়ে রওনা দিলাম সাফদারপুরের পথে।

২৩

মাগুরা যখন পৌঁছি তখন দুপুর হয়ে গেছে। ভায়নার মোড়ে বাস থামলো। যাত্রীরা ওঠানামা করছে। কয়েকজন রাজাকার বাসের কাছে এসে ড্রাইভারকে বাস থামিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলো। তাদের আরো কয়েকজন সঙ্গী আসবে, তারপর বাস ছাড়তে হবে। তারা সবাই ঝিনাইদহ যাবে। ড্রাইভার দেরী করতে রাজী নয়। সে গাড়ি ছাড়তে চায়, ওরা ছাড়তে দেবে না। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়েই দিলো। এতে রাজাকাররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং সামনে যে রাজাকার গ্রুপটি আছে তাদেরকে সংকেত দিলো বাস

থামাতে। ড্রাইভার পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বেপরোওয়াভাবে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে দিলো। এতে রাজাকার কয়েকজন গাড়ি চাপা পড়ে এমন অবস্থা। গাড়ি ওদেরকে অতিক্রম করা মাত্রই ওরা রাইফেল তাক করে গাড়ি লক্ষ্য করে পেছন দিক থেকে গুলি করতে আরম্ভ করলো।

আমি ড্রাইভারের পেছনের সিটে বসা। মাথা নিচু করে একেবারে মিশে গেলাম গাড়ির পাটাতনের সাথে। রাইফেলের গুলি গাড়ির পেছন দিক ভেদ করে ভেতরে এসে আঘাত করছে। আর্তনাদ শুরু হয়ে গেছে ভেতরে। এক খণ্ড কাঠ ভেঙ্গে এসে আমার মাথায় পড়লো। ভাবলাম গুলি লেগেছে, মাথায় হাত দিয়ে দেখতে সাহস হলো না। যেমন ছিলাম তেমনই পাটাতনের সাথে মিশে পড়ে রইলাম। মিনিট পাঁচেক হবে না এর মধ্যে ঘটে গেলো ঘটনা। গুলি থেমে গেলো। আস্তে আস্তে মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, ঠিক আছি। মাথা উঁচু করে দেখলাম স্টিয়ারিং ধরে ড্রাইভার সাহেব সোজা হয়ে বসে আছে। পেছনে রক্তারক্তি অবস্থা। একজনের মাথায় গুলি লেগেছে মগজ দেখা যাচ্ছে। দেহটা ছটফট করে লাফাচ্ছে। কারো হাতে, কারো পায়ে গুলি লেগেছে। সে দৃশ্য তাকিয়ে দেখা যায় না। গাড়ির পেছন দিক থেকে এক অংশ খুলে পড়ে গেছে। গাড়ির গতি আরো বেড়ে গেছে। পেছনের বাসে ছুটে আসছে রাজাকাররা। পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রাইফেল। দুই গাড়ির দূরুত্ব বেড়ে যাওয়াতে গুলি থেমে গেছে। গাড়ির গতি একই রেখে ড্রাইভার বিপরীতমুখী গাড়ির সাইড দিচ্ছে। এমন অবস্থা যে, যে কোন মুহূর্তে গাড়ি খাদে পড়ে যেতে পারে অথবা প্রচণ্ড বেগে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যেতে পারে।

মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ ১৭ মাইল পথ। এই সময়ের মধ্যে আমরা ঝিনাইদহ শহরের কাছে চলে এসেছি। পেছনে ঐ বাস আর দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার একইভাবে বসে আছে সিটের সাথে খাড়াভাবে পিঠ লাগিয়ে। এই অবস্থায় গাড়ি সোজাসুজি ঝিনাইদহ সদর থানায় ঢুকে গেলো। দারোগা পুলিশ ছুটে এলো। পেছনে রাজাকাররা ছুটে আসছে, এ ঘটনা রাজাকারদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে ইত্যাদি শুনে ওসি সাহেব বললেন, আমার কিছুই করার নেই, আপনারা মিলিটারী ক্যাম্পে যান। এখন সব কিছু তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। মুখের কথা মুখে থাকতে ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে গেলো। রাজাকাররা এ কাজ করেছে শুনে তাঁরা বললেন, থানায় ডাইরী করিয়ে যান, আমরা দেখবো। এতোক্ষণে হতাশ হয়ে পড়লো ড্রাইভার। বুঝতে পারলো রাজাকারদের বিচার করার কেউ নেই। গাড়ি থানায় নেবার আগে সে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। আমি ওখানেই নেমে যশোরের লাইনে ভিন্ন বাসে উঠে পড়লাম।

বাসে বসে ঠিক করলাম বারবাজার হয়ে যাত্রাপুর যাবো। বারবাজার রাজাকারদের ক্যাম্প আছে আগেই বলেছি। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাত্র নয় মাইল রাস্তা, কাজেই বারবাজারে মিলিটারীদের আনাগোনা সব সময় আছে। কিন্তু ভেতরে যেতে এখন আর কারো সাহস হচ্ছে না। প্রথম দিকে যখন গ্রামে গ্রামে আগুন দিতো তখন কালীগঞ্জের দিক থেকে মিলিটারীরা বৈকেরগাছি গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিলো। তার বেশী আর যেতে হয় নি।

মানুষ প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এই এলাকায় অনেক গ্রামে হিন্দু আদিবাসিদের বসবাস। বন্য প্রাণী শিকার, ধামাকুলো তৈরি, জুতো সেলাই ইত্যাদি যাদের পেশা তারাও এখন ভারতে শরণার্থী। শুধু এখানকার নয়, সারা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই নিম্ন জাতের মানুষগুলো, গান্ধীজি যাদের নাম রেখেছেন হরিজন, তারা এখন শরণার্থী শিবিরে। কেমন আছে তারা ওখানে ? এখানেই তো তাদের কেউ ছায়া মাড়ায় না। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে পারে না। দোকানে বসে কিছু খেতে পারে না। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের সীমাখালী বাজারে একদিন চায়ের দোকানে বসে আছি। পাশে বসে জুতা সেলাই করছে এক যুবক। আমার স্যান্ডেল জোড়া সে ঠিক করে দিচ্ছে। আমি দোকানীকে দুই কাপ চা দিতে বলি, একটা আমার, বাকীটা ঐ ছেলের জন্যে। একটু পরে দোকানী এক কাপ চা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। আমি কাপটা হাতে নিয়ে আবার বল্লাম, ওকে এক কাপ চা দাও। আমি চা খেতে শুরু করেছি। দেখি, ওকে চা দেওয়া হয়নি। কেন ওকে চা দেওয়া হচ্ছে না ? একটু জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করায় দোকানী বললে, ওদের আমরা চা দিতে পারি না। ওরা 'মুচি'। আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বের হলো না। দেখি, যুবকটির নিচু মাথা আরো নিচু করে ফেলেছে। আমার সামনে তখন গান্ধীজীর নেংটি পরা চেহারাটা কেবল ভেসে উঠতে লাগলো। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সেদিন উঠে পড়ি।

২৪

বারবাজার থেকে যাত্রাপুর রওনা হয়ে গেলাম। এই রাস্তায় হেঁটে যায় এমন সাধ্য কার! কিছুদিন আগেও শরণার্থীরা দলে দলে চলেছে এ রাস্তায়। শরণার্থীদের দুঃখকষ্টের যে চিত্র আমি দেখেছি তার কিছু কথা আগে বলেছি। এখন নিজেকে ঐ মিছিলের একজন মনে করে হাঁটতে শুরু করলাম। এই এলাকা আমার খুব চেনা। আশপাশের সব কিছু মনে হয় আমার অতি আপন। অসংখ্যবার আমি এই রাস্তায় যাতায়াত করেছি। ১৯৬০-৬২ সাল পর্যন্ত আমি হাসানহাটি বড়ধোপাদী জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। যাত্রাপুর, বড় ধোপাদী, হাসানহাটি—এই তিন গ্রামের মোহনায় বড় রাস্তার ধারে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই স্কুল। এই তিন গ্রামের যে তিনজন মানুষ এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর একজন হলেন আমার দুলাভাই। তিনি একজন শিক্ষকও বটে, যাঁর কথা আগেই বলেছি। বাকী দুজনের একজন হাসানহাটির মাফি বিশ্বাস আর একজন বড় ধোপাদির সুবরাত বিশ্বাস।

বহু স্মৃতিবিজড়িত এই পথে একা একা চলতে কত কথাই না মনে হতে থাকে! সাঁকো মতনপুর, নলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের কত ছেলেমেয়ে আমার সহপাঠী ছিলো! রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ২/৩ মাইল পথ পায়ে হেঁটে তারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। গান বাজনা পূজো পার্বণ লেগেই থাকতো এ সব গ্রামে। একবার আমার এক সহপাঠী নাম কানাই। দুর্গা পূজার সময় বাজী তৈরি করতে যেয়ে একখানা হাতই প্রায় হারিয়ে ফেলে। সেই মুখরিত গ্রামগুলো বলা যায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে, এমন কি গরু ছাগল হাঁস মুরগির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাঝে মাঝে রাস্তায় শেয়াল উঁকি মারে। পাখির ডাক নীরবতা ভঙ্গ করে। স্কুলের সামনে পৌঁছে দেখি, সেই মাঠ, সেই সুন্দর পরিবেশ তছনছ হয়ে গেছে। কোটচাঁদপুর স্কুলের মাঠের যে অবস্থা দেখেছি তার চেয়ে শত গুণ খারাপ অবস্থা এখানে। শরণার্থীদের রাত্রি যাপনের নিরাপদ স্থান ছিলো স্কুল চত্বর। এখানে শরণার্থীদের ওপর কোনো হামলা হয় নি। লুটেরা বাহিনী এখানে জুত করতে পারেনি। তাই এখানে শরণার্থীদের চাপ বেশী ছিলো।

স্কুলের সামনে কাঠ বাদাম গাছটা আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতিবিজড়িত এ গাছের তলায় একটু না বসে যেতে পারলাম না। এক সময় এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা মিছিল করেছি, প্রতিবাদ সভা করেছি, হরতাল পালন করেছি। অজ্ঞ গ্রামের মানুষ হাতের কাজ রেখে অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে আমাদের মিছিলের দিকে। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। সেদিন আমরাও এখানে হরতাল পালন করেছি। প্রতিবাদ সভা করেছি। অনেকে বলেছে, তোমরা এখানে এগুলো কেন করছো? তোমাদের কথা না কোনো পত্রিকায় ছাপা হবে, না দেশের কেউ জানবে। অহেতুক তোমরা পড়াশুনা বন্ধ করে হৈ চৈ করছো। সেদিন কি উত্তর দিয়েছি মনে নেই। তবে উত্তর যা-ই দিয়ে থাকি তার অর্থ ছিলো, একদিন এ সবের প্রয়োজন হবে, আকাশে বাতাসে জমা হয়ে থাকবে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের শ্লোগান। শিক্ষকরা আমাদের ভালবেসেছেন, তরুণ শিক্ষকরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জন্ম থেকে বাম হাতহীন মহিউদ্দিন স্যার, যিনি মহি মাস্টার নামে স্কুলে ও এলাকায় পরিচিত, তিনি এ সব ব্যাপারে সব সময় আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। একখানা হাত না থাকলেও তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী চেতনার মানুষ। খেলাধূলা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সর্বোপরি সুন্দর জীবন যাপনে তিনি আমাদের পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন। ইদানীং খোঁজ নিয়ে জেনেছি, খুব শীঘ্রই তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ফেলে আসা জীবনের যে সব মানুষের কথা ফেলে আসতে পারিনি মহি স্যার তাঁদের মধ্যে একজন। ঝিনাইদহ জেলার ৪ নং আসনের বর্তমান এমপি সহিদুজ্জামান বেল্টু এই স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলো। ১৯৯১এর নির্বাচনেও সে এই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলো। সে ঐ মাফি বিশ্বাসের ছেলে যাঁর কথা একটু আগে বলেছি।

এখানকার স্কুল জীবনের একটি ছোট্ট স্মৃতি এখানে এসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছোট ধোপাদী নামে বেশ দূরের এক গ্রাম থেকে আসতো আমাদের এক মেয়ে সহপাঠী। আমরা তখন সেভেন-এইটে পড়ি। আমাদের সময়, বিশেষ করে গ্রামের স্কুলে আমরা বেশ বড় বড় ছেলেমেয়ে সেভেন-এইটে পড়তাম। তখন মর্নিং স্কুল। একদিন সকাল বেলা মেয়েটি আমার কাছে এসে বলে, মান্নান ভাই, আপনার সাথে আমার আর কোনো দিন দেখা হবে না। একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামীকাল থেকে আমি আর স্কুলে আসবো না। এ কথাটি আপনাকে বলার জন্যে আজ আমি স্কুলে এসেছি। সে স্মৃতি আমাকে উদাস করে তোলে। এমন করেই শিক্ষা জীবন ঝরে গেছে কত অগণিত মেয়ের! এমন করেই ভেঙ্গে গেছে কত মেয়ের স্বপ্নসাধ! তবে সে যে এই কথাগুলো বলতে পেরেছিলো সেজন্যে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাকে একজন অসাধারণ রমণী মনে করি। কারণ সেদিনের গ্রাম্য সে সমাজে এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিলো।

২৫

আমাকে দেখে রেন্টু কেন্টু আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। মামা এসেছে, কি মজা! দুলাভাই জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তুমি এ সময় কি মনে করে ? বললাম, মানিকগঞ্জ থেকে এসেছি। বুবু পাঠিয়েছেন, আপনার জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন। আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে বলেছে। তিনি হেসে দিয়ে বললেন, নিয়ে যেতে বলেছে আর তুমিও আমাকে নিতে চলে এসেছো। তোমার কি ধারণা আমি এখানে থাকতে পারছি না ? বললাম, না, না, ওরা যা বলেছে তাই আমি বললাম। আমিও জানি উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে হাজার হাজার শরণার্থী ভারতে গেছে। তার সহযোগিতায় এ এলাকা তারা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করেছে। স্কুল মাঠের শরণার্থীদের সেবায় তিনি লোকও নিয়োগ করেছিলেন।

এখান থেকে শরণার্থীরা যতই বর্ডারের দিকে এগিয়ে গিয়েছে ততোই তাদের লুটেরা বাহিনীর শিকার হতে হয়েছে। অবশ্য মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা প্রথম দিকে ৩৯ দিনের ট্রেনিং শেষে বেরিয়ে পড়ার পর তাদের সাথে যারা বর্ডার এলাকার কাছাকাছি যেয়ে যোগাযোগ করতে পেরেছে তারা এক প্রকার নিরাপদেই পাড়ি দিতে পেরেছে। দ্বিতীয়বার আমি যখন ভারতে যাই তখন বর্ডারের কাছাকাছি এমন একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। বয়রা বর্ডার হয়ে তারা ভারতে যেয়ে শরণার্থী হবে। তারা বরিশাল এলাকা থেকে এসেছে। চার দিন চলছে

তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছে স্থানীয় একশ্রেণীর লুটেরা। এরা নাকি ভালো পার্টি। ভালো সোনাদানা টাকা পয়সা পাওয়া যাবে এদের কাছে। তাই বলা হচ্ছে বর্ডারের অবস্থা খারাপ, মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে। এখন বর্ডার অতিক্রম করতে গেলে সবাইকে মারা যেতে হবে। সুযোগমত তাদের কাছে টাকা পয়সা যা কিছু আছে তা সব ছিনিয়ে নেয়াই মূল উদ্দেশ্য। এ সব কথা বলে তাদের আটকিয়ে রাখা হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে তারা পড়ে আছে। মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছুটে গেছে; বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অবস্থা বেশী খারাপ। অন্তত ৫ জন শিশুকে দেখলাম যারা চোখ মেলতে পারছে না।

এ অবস্থা দেখে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিলো না। আমরাও তখন এদের মতোই যাত্রী। তবে আমরা ওদের ছেড়ে যাবার সময় বলে গেলাম, আমরা যেয়ে মুক্তি বাহিনীকে খবর দেবো এবং ব্যাপারটা তাদের জানাবো। পরে শুনেছি, এ কথা ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। চারদিকে খবর হয়ে গেছে মুক্তিবাহিনী আসছে। মুক্তিবাহিনী আসা মানে সাইক্লোন বয়ে যাওয়া। মুহূর্তের মধ্যে মতলববাজরা সব উধাও হয়ে যায় এবং ইত্যবসরে আটকেপড়া শরণার্থীরাও নিরাপদে বর্ডার অতিক্রম করে চলে যায়।

ছোট বুবু বল্লেন, ধোপাদী স্কুলে পড়ার সময় তোমার যে সব সঙ্গী-সাথী ছিলো তারাই এখন এ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা। উলাদ কয়েকদিন আগে এসে দেখা করে খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে।

উলাদ এলাকায় আছে বলে জানতে পারলাম এবং পরের দিনই তার সাথে দেখা হয়ে গেলো। ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো একেবারে। কতদিন পরে আপনার সাথে দেখা! বললাম, চলো, কোথাও বসে কথা বলি। আমরা স্কুলে যেয়ে বসলাম। আমি এখানে এসেছি একথা সে গতকালই শুনেছে। বললো, কেউ এলাকায় ঢুকলে আমি খবর পাই। এই স্কুলে পড়ার দিনগুলোর কথা ভুলতে পারি নে মান্নান ভাই। আপনার কাছেই তো আমাদের হাতে খড়ি। মিটিং মিছিল আর প্রতিবাদ—এসব তো আপনিই শিখিয়েছেন আমাদের। থাক থাক, যা বলার মতো না তা আর বোলো না। তার কথায় বাধা দিলাম। একটু থেমে সে বললো, আপনার কি মনে আছে একবার আমাদের সকলকে যশোর নিয়ে গিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মিটিং শুনতে এবং সেই মিটিং-এ আমরা প্রথম শেখ মুজিবকে দেখি ? বললাম, সে সব স্মৃতি কোনোদিন ভুলে যাবার মতো নয়। পাঞ্জাবী পাজামা পরে মঞ্চে একখানা চেয়ারে বসে আছেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব, সামনে একটা টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। বাকী নেতারা মঞ্চে পা গুটিয়ে বসে আছেন। আর শেখ মুজিব মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। সে কি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ, জনাকীর্ণ টাউন হল ময়দান একেবারে অভিভূত হয়ে শুনছে আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। সেদিন শেখ মুজিব কি সব কথা বলেছিলেন তা কিছু আপনার মনে আছে ? বললাম, সেদিনই জীবনে প্রথম আমি শেখ মুজিবকে দেখি, তাঁর ভাষণ শুনি, যাঁর একটা কথা আজো আমার মনে আছে। আইয়ুব খানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, আমার দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে পাটের টাকায় পাকিস্তানের রাজধানী করাচী বাদ দিয়ে

রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মরুভূমিতে প্রাসাদ তৈরি করা হচ্ছে। মনে রেখো, রাওয়ালপিন্ডিতে শুধু পাকিস্তানের রাজধানীই তৈরি হচ্ছে না, পাকিস্তানেরও পিণ্ডি তৈরি হচ্ছে।

উলাদ বল্লে, মজার ব্যাপার হলো, সেদিন ফেরার পথে যশোর থেকে বারবাজার পর্যন্ত বাসে আমরা কোন ভাড়া দিইনি। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি, একেবারে কেলেংকারী অবস্থা! আমাদের সহপাঠী মোসেহকাক্কা এখনো দেখা হলে সে ঘটনাটি বেশ ঘটা করে বর্ণনা করে, যা শুনলে এখন শরম লাগে।

বললাম, এখন এসব কথা থাক, যুদ্ধের কথা বলো। অনেক কথাই বললো উলাদ। সে তার দলের কমান্ডার। ভেতরে ঢুকেছে কয়েকদিন আগে। প্রথমে কল্যাণীতে, পরে চাকুলিয়ায় ট্রেনিং গ্রহণ করেছে। তারপর কোথায় কোথায় গেছে, কোথায় কি অপারেশন করেছে, ভয়াবহ সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। এক ফাঁকে এলাকার খবর জানতে চাইলে সে বলে, এলাকায় তেমন কোনো সমস্যা নেই। রাজাকার আর এ এলাকায় আসতে পারবে না। সে সাহসও ওদের হবে না। চৌগাছা কোটচাঁদপুরের মধ্যে মিলিটারী মুভ করতে পারে। যদি করে আমরা হাকিমপুরের কাছে ওদের প্রতিরোধ করবো। তাছাড়া আমরা কয়েকটা দল মিলে বড় ধরনের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেটা হবে বারবাজার কালীগঞ্জের মাঝে রঘুনাথপুরের ওখানে। এর জন্যে সেক্টর কমান্ডার থেকে নির্দেশ আসার অপেক্ষায় আছি। লক্ষ্য করলাম উলাদের চোখে মুখে যেনো আগুন জ্বলে উঠছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্যারকে নিয়ে কোনো সমস্যা আছে নাকি? হেসে দিলো উলাদ, আরে না মান্নান ভাই, আপনি বুঝি সেই ভয় করছেন ? বললাম, ভয়তো একটু করেই। এক সময় মুসলিম লীগ করতো। এলাকায় মৌলভী বলে পরিচিত। ওয়াজ-নসিয়ত করে বেড়ায়। উলাদ বেশ দৃঢ়তার সাথে বল্লে, স্যার স্বাধীনতাবিরোধী কাজ কখনো করে নি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। স্যারের কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া কোথাও কোনো অভিযোগ স্যারের বিরুদ্ধে নেই। শরণার্থীদের সহযোগিতা করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে থাকতে খেতে দিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আর আপনি তো জানেন, আমি এদিকে এলে স্যারকে সালাম না দিয়ে যাইনে, আর বুবুর হাতের কিছু একটা না খেয়ে গেলে মনে হয় এদিকে আসাটা অপূর্ণ রয়ে গেলো। স্যারের বাড়িও আমাদের জন্যে একটা নিরাপদ যায়গা। কথায় কথায় উলাদ বললো, আপনি যে ভারতে ট্রেনিং ক্যাম্পে যাননি তা আমি বুঝেছি। বল্লাম, যাবার দিন কি শেষ হয়ে গেলো, যেতে তো হবেই। তখন ও বল্লে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব এসেছিলেন আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে। আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন হবে এবং খুব শীঘ্রই স্বাধীন হবে। '৭১ সাল পার হবে না। উলাদ আরো বললো, পরে শুনেছি এখন থেকে আর কাউকে যুদ্ধের ট্রেনিংও দেয়া হবে না।

কোনো রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে উলাদ বললো, প্রশিক্ষণের সময় একদিন আমাদের কোম্পানীর ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের কোনো

রাজনৈতিক ক্লাস হবে কিনা? পরে বুঝলাম এই প্রশ্ন করা আমার বোকামি হয়েছে। এর জন্য আমার চরম বিপদ হতে পারতো। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন বলেছিলো এর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের নেতারা আছেন, আওয়ামী লীগ আছে, রাজনৈতিক বিষয় তাঁরা দেখবেন। ৮ নং সেক্টরে ছিলাম বলে সেদিন জীবনে বেঁচে গেছি। শুনেছি কোনো কোনো সেক্টরে বামঘেঁষা বলে কারও ওপর কোনো রকম সন্দেহ হলে তাকে সোজা ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মুজিব বাহিনী পাকিস্তানীদের মত ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির লোকদের শত্রু মনে করে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে যেয়ে এই সব ছেলেকে খুঁজে খুঁজে ধরে নিয়ে গেছে। বললাম, এসব খবর প্রবাসী সরকার নিশ্চয় জানেন। ও বললো, আমরা যতোদূর জানি মুজিব বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ একটা স্বতন্ত্র বাহিনী। এদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যতোদূর শুনেছি এ বাহিনী ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে। আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম ভারতকে দোষারোপ করার কিছু নেই। বর্ডার খুলে দিয়েছে, এক কোটি লোককে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের একবেলা অন্ন জোটাতে সরকারকে হিমশিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। অস্ত্র দিয়েছে, ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে দিয়েছে। শুনেছি সে দেশের জনগণের ওপর শরণার্থী ট্যাক্সও বসিয়েছে। এর পরে আর কথা চলে না। আমরা চাই স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর এমন কিছু যদি আমাদের নেতারা করেনই, তা তিনি যেই হোন, সেটা হবে আত্মঘাতী ব্যাপার। ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের ক্ষমা করবে না। বললাম, এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা ঠিক হবে না, দেশ স্বাধীন হলে হয়তো দেখা যাবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা উলাদ সম্পর্কে শেষ কথাটা এখানে বলে রাখি। স্কুলে সে আমার এক ক্লাস নিচে পড়তো। কেন যেন ঘুরে ফিরে আমার কাছে কাছে থাকতো, মান্নান ভাই, মান্নান ভাই বলে ডাকতো। ঝিনাইদহ জেলায় কালীগঞ্জ থানায় মান্দারবাড়িয়া গ্রামে তার বাড়ি। বলিষ্ঠ একহারা শ্যামলা চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবক। কালীগঞ্জ বারবাজার চৌগাছা কোটচাঁদপুর এলাকার মেদিনী কাঁপানো এই মুক্তিযোদ্ধা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নৃশংসভাবে খুন হয়ে যায়। রাস্তার ধারে পড়ে থাকে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ।

কেউ বলে, এলাকার নেতৃত্ব গ্রহণের কোন্দলে সে মারা পড়েছে। কেউ বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলায় সুবিধাবাদী মহল তাকে সরিয়ে দিয়েছে। আবার রাজনৈতিক মত পার্থক্যও তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

ওর বাপ ছেলের শোকে পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় প্রলাপ বকে বেড়ায়। উলাদের কথা মনে হলে এখনও চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না। মুখে কোনো কথা আসে না। তখনোও যেমন ভালো লাগতো ওকে, এখনো তেমনি ভালোবাসি ওর স্মৃতিকে। একই সময় খুন হয় ওদের দলের যাত্রাপুর গ্রামের আলম। বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমের লাশ পড়ে থাকে বৈকেরগাছি মাঠে। চেনার কোনো উপায় ছিলো না। ছোটবেলায় ভেঙ্গে যাওয়া দাঁত দেখে ছেলের লাশ সনাক্ত করে তার বাবা। এরপর একবার আলমের বাবার সাথে আমার

দেখা হয়েছিলো। আমাকে দেখে সে কি আর্তনাদ। তারপর বেশি দিন তিনি আর বাঁচেন নি। কেন মারা গেলো আলম ? এলাকার মানুষের সাথে আলমের বাড়াবাড়ির কথা শোনা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তার মৃত্যুর কারণ উলাদের মৃত্যুর কারণের সাথে অভিন্ন বলে আমার মনে হয়েছে।

মাঝে একদিন যাত্রাপুর থেকে পরের দিন সাফদারপুরের উদ্দেশে রওনা। পায়ে হেঁটে হাকিমপুর হয়ে কোটচাঁদপুর যাই। যাবার সময় ভাগ্নে ভাগ্নি দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, মামা, আপনি যাবেন না। দুলাভাই বল্লেন, তোমার এভাবে চলাফেরা করা ঠিক হচ্ছে না। ছোট বুবু ধমকের সুরে সেই আগের মতো করে বললেন, ওই 'ভাদামে'কে কিছু বলে লাভ নেই, যেদিক খুশি যাক গে।

আমার তখন কারো কথাই কানে যাচ্ছে না।

উলাদের সাথে কথা বলার পর মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আমরা স্বাধীন হবো। এ অনুভূতি শুধু মনের ভেতরটা চঞ্চল করে তোলে। কবে সেদিন আসবে ? দুচোখ ভরে শুধু আকাশ দেখতে ইচ্ছে করে। সবুজ গাছপালা দিগন্তজোড়া মাঠ দুচোখে স্বপ্ন জাগায়।

২৬

যশোর-চুয়াডাঙ্গা লাইনে ট্রেন চলাচল তখনো থেমে যায়নি।

সাফদারপুরের একটা টিকিট কিনে কোটচাঁদপুর থেকে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। উঠেই থমকে গেলাম। কামরায় যে কয়জন যাত্রী সবাই অবাঙ্গালী এবং তারা শেখ মুজিব, জয় বাংলা, সোনার বাংলা নিয়ে এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় নাচ গানে মত্ত। পান চিবাচ্ছে আর নেচে গেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। হাত তালি দিয়ে তালে তালে একে অপরের গায়ে পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দু'একজন আঙ্গুল দিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করে নাচ গানের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। রীতিমত সে এক বীভৎস দৃশ্য! দরজার পাশে বসে পড়লাম। স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ভয় করতে লাগলো। কোটচাঁদপুরের পরেই সাফদারপুর স্টেশন। ওদের পৈশাচিক নৃত্যগীত শেষ হওয়ার আগেই ট্রেন সাফদারপুর পৌঁছে গেলো। আমিও নেমে গেলাম।

এর কয়েকদিন আগে আমার ঐ ভায়রার ভগ্নিপতি জহুরুল হককে খুলনা থেকে আসার পথে, খুলনা যশোরের মাঝামাঝি স্থানে চলন্ত ট্রেন থেকে মেরে ফেলে দেয়। তিনি

বন বিভাগে সহকারী কনজারভেটর পদে চাকুরী করতেন। পরিচিত একজন পাশের কামরা থেকে এ দৃশ্য দেখে সাফদারপুর এসে খবর দেয়। পরে ট্রেন লাইনের ধারে পাওয়া যায় তাঁর ক্ষত বিক্ষত লাশ। তাঁর সন্তান মায়ের পেটে থাকতে পিতৃহারা হয়ে যায়। সেই সন্তান বুকে ধারণ করে আজো বিধবা বেশে কেঁদে ফেরে তাঁর স্ত্রী। সেদিন ওদের পৈশাচিক উল্লাস থেমে যাওয়ার আগে ট্রেন সাফদারপুর স্টেশনে পৌঁছে না গেলে আমাকেও হয়তো এমনই ভাগ্য বরণ করতে হতো।

বাজারে ঢুকতে রাজাকারদের সাথে দেখা। এবার তেমন সন্দেহের চোখে দেখলো না, বরং কেমন আছি জিজ্ঞেস করলো। রসিকজন সবখানেই থাকে। একজন বলে বসলো, যান দুলাভাই, আপা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকিয়ে দেখি দোতলার বারান্দায় বোড়ন দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর সুরুজ আসলো। সুরুজের এ বাসায় অবাধ চলাফেরা। এই মুহূর্তে তার উপস্থিতি অর্থপূর্ণ। সে আমাকে সালাম দিয়ে ইঙ্গিতে বলে গেলো জয় বাংলা পত্রিকা সে আমার জন্যে রেখে দিয়েছে। পরে কথা হবে বলে তাকে বিদায় দিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে বাজারের দিকে গেলাম। বাজার প্রাণহীন হয়ে গেছে। ২/১ জনের সাথে সামান্য কথা বলে ফিরে এলাম। দেখি. বুবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। বুবুর মতো এমন মিষ্টি মধুর স্বভাবের মানুষ আমি জীবনে দেখেছি বলে মনে হয় না। ভেতরে চলে এলাম। ভাই সাহেব মানে ভায়রা সাহেব খাওয়ার টেবিলে রেডিও নিয়ে বসে আছেন। *চরমপত্র* শুনবেন বলে। পাশে এসে বসলাম। বল্লেন, সব কিছু ফেলে একদিকে চলে যাবো তা যেমন সম্ভব নয়, আবার এভাবে সবাইকে নিয়ে এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। কখন কি ঘটে যায় ঠিক নেই।

বললাম, আপনাদের এলাকা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে আমার মনে হয়। এখানে যুদ্ধ হওয়ার আশংকা কম। স্থানীয় পরিস্থিতি যদি সামাল দিয়ে চলতে পারেন তা হলে কোনো ভয় নেই। চৌগাছা এলাকার লোকজন বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতেও বলা হয়েছিলো। এই মুহূর্তে আপনার পক্ষে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকায় যাওয়া কোনো অবস্থায় সম্ভব হবে না। যে কোনো লোককে যে কোনো সময় ওরা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে বরং সে ভয় অনেকটা কম। আর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা নিয়ে ভারতে চলে যেতে পারেন। তবে তার আর দরকার নাও হতে পারে। তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। সবাই দেখলাম আমার কথা শুনে চমকিত হয়ে উঠলেন। আমি নেতাদের মতো করে বললাম, এ বিজয় ঠেকিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা কারো নেই। জয় আমাদের হবেই। আমরা স্বাধীন হবোই হবো। এই সময় শুরু হলো স্বাধীন বাংলা বেতারে এম আর আখতার মুকুলের *চরমপত্র* পাঠ।

রাতেই সুরুজ এক ফাঁকে এসে তার দায়িত্ব পালন করে গেছে। দুই কপি জয় বাংলা গোপনে আমার হাতে দিয়ে গেছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে হারিকেনের আলোয় এক নজর দেখে নিয়ে অন্য কাগজের ভেতরে ঢুকিয়ে ব্যাগের তলায় রেখে দিয়েছি। রাতে সবাই খেতে বসেছি। খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় বাড়ি ঘেরা উঁচু প্রাচীরের পেছনের দরজায় খট খট শব্দ হলো। আমরা সবাই পরস্পরের দিকে তাকালাম। ভাই সাহেব বল্লেন, তোমরা থাকো, আমি দেখছি। ঘুরে এসে বুবুকে বল্লেন, ৫/৬ জনের খাবার ব্যবস্থা করো। বুবুর মধ্যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজের মেয়েটাকে ডাক দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। আমাকে নিয়ে ভাই সাহেবের সাথে তাদের কথা হয়েছে। আমারও তাদের সাথে সামান্য কথা হলো। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাদের খাবার পরিবেশন করা হলো। দ্রুত খাওয়া শেষ করে তারা চলে গেলো।

কারা এসেছিলো, কেন এসেছিলো বাড়ির কারুরই তা জানার দরকার নেই। সবাই জানলোও না। মিলিটারী রাজাকার স্থানীয় এজেন্ট তথা তথাকথিত সরকার যারা মুক্তিযোদ্ধাদের বলে অনুপ্রবেশকারী, তারা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় তাহলে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্যে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। এ কথা জেনেও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে এদেশের সাধারণ মানুষ।

ভাবনার কোনো শেষ নেই। বসে থাকারও সময় নেই। বললাম আমি সকালে চলে যাবো। যাবার পক্ষে যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হলাম। তবুও বিশেষ করে বুবুকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমি থাকবো না। বুবু বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, যেতে চাও, যেও। বোনদের স্নেহে পরিপূর্ণ আমার জীবন। তারপর বোড়ন সকলের ছোট হওয়ায় সেদিক থেকেও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একেবারে শৈশবে মাতাপিতা হারনোই হয়তো বোনদের স্নেহের কারণ হয়ে থাকবে। অনেকটা ভবঘুরে জীবন বলেও সেটা হতে পারে।

রাজাকাররাও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনে বলে আমার ধারণা হলো। ওদের সাথে আলাপ করে বুঝেছি, মুক্তিবাহিনীর সাফল্য, গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি খবর ওরা রাখে। ওরা হয়তো বুঝতে পেরেছে দ্রুত ওদের দিন শেষ হয়ে আসছে। অবাঙ্গালীরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে, ওরা যাবে কোথায়? তাই ক্রমেই ওরা হিংস্র হয়ে উঠছে। এখানকার কথায় বলি, প্রায় প্রতিদিনই বাজারে আসে আর মানুষের সাথে পাগলা কুকুরের মতো আচরণ করে।

স্টেশনে এসে দুইজন রাজাকারের সাথে দেখা হলো, তারা ঝিনাইদহ যাবে। ওদের সাথেই ট্রেনের একই কামরায় উঠে পড়লাম। এতে সুবিধা হলো, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও ঝিনাইদহের মতো কঠিন চেক পোস্ট এড়ানো গেলো।

ওদের সাথে সাথে বাস থেকে নেমে গেলাম। ঝিনাইদহ গার্লস স্কুলের সামনে রহমান নামে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর খোঁজে তার ভাইয়ের কাপড়ের দোকানে গেলাম। দোকান

বন্ধ দেখে ফিরে আসছি এমন সময় মহসিনের সাথে দেখা। ঐ অবস্থায় তাকে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলাম, সর্বনাশ! তুমি তো এখনই ধরা পড়ে যাবে। মুক্তিযোদ্ধার ষোল আনা চিহ্ন তোমার চেহারায় ফুটে আছে। শীঘ্রই এখান থেকে সরে পড়ো, চলো কোথাও বসে কথা বলি। সে তার এক আত্মীয়র বাসায় নিয়ে গেলো। চা খেতে খেতে বললো, কতকগুলো দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলাম। সব শেষ, একটা কাজ বাকী ছিলো, এখন সেরে এলাম। এসডিও সাহেবের সাথে দেখা করে এলাম। বল্লাম, এতো রিস্ক নেয়া তোমার ঠিক হয়নি। হাসি দিয়ে বল্লে, সে ব্যবস্থা করেই গিয়েছিলাম, হাতে ছিলো রিলিফের আবেদনপত্র। তাছাড়া আমার এক চাচার মাধ্যমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে তবে গিয়েছিলাম। কাজটা ছিলো এসডিও সাহেবের কাছ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্যপত্র স্বাক্ষর করানো। এটা সেটা আলাপ করার পর যখন আসল কথাটা বলে কাগজখানা এগিয়ে দিলাম, এসডিও সাহেব নড়েচড়ে বসে বল্লেন, না না, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বল্লাম, দিলে ভালো করতেন, দেশ স্বাধীন হলে অন্তত চাকরীটা বাঁচাতে পারতেন। উত্তরে তিনি বল্লেন, দেশ স্বাধীন হলে দেশ চালানোর জন্য তাদের প্রয়োজন হবে। তাঁরও অনেক আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগ করে। তারা এখন ভারতে আছে। আরো বললেন, যুদ্ধতো পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে, বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নয়।

মহসিন সাহসী ছেলে। সেদিন সে এসডিও সাহেবকে বলে এসেছিলো, দেশ স্বাধীন হলে প্রশাসন যন্ত্রকে ঢেলে সাজানো হবে। কিন্তু আমার কাছে মহসিন সেদিন দুঃখ করে বলেছিলো, মান্নান ভাই, আমরা বোধ হয় পরিকল্পনাহীন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। ২৫শে মার্চের আগে সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করেছে কিন্তু পরে কি হলো ? গুটি কয়েক ছাড়া চেয়ার ছেড়ে কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি। বৃটিশ সৃষ্ট আমলাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি।

দীর্ঘদিন পরে ১৯৯৬ সালে মহসিনের সাথে আমার আবার দেখা। তারপর প্রায় দেখা হয়, কথা হয়। অনেক সময় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো তর্কও হয়।

সেই সাহসী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মহসিন ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পারে নি। নিতান্তই সাদামাঠা আটপৌরে জীবন। একটা এনজিওর সাথে জড়িত। তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৬৯ সালে ২৪শে জানুয়ারী। মতিউরের লাশ সামনে নিয়ে তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে যখন শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় তখন আমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। সেখান থেকেই আমাদের পরিচয় ঘটে।

যশোর জেলার (এখন ঝিনাইদহ জেলা) শৈলকুপা থানায় পদ্মনগর তার বাড়ি। তারপর মিটিং-মিছিলে তার সাথে দেখা হয়েছে অনেকবার। তখন সে থাকতো কমলাপুর তার এক আত্মীয়ের বাসায়। এরপর বনগাঁয় যখন তার সাথে আমার ক্ষণিকের জন্যে দেখা হয়েছিলো, তখন সে মুক্তিযোদ্ধা। ৩৯ দিনের ট্রেনিং শেষ করে বনগাঁ এসেছিলো ২ দিনের ছুটি নিয়ে বিশেষ কোন কাজে। ১৯৯৬ সালে এসে মহসীন আবার সেই আক্ষেপের সুরে বললো, আমরা কি পেরেছি সেই প্রশাসন যন্ত্রকে ঢেলে সাজাতে? পারি নি। বিপুল সম্ভাবনাময়

সুযোগ এসেছিলো ১৯৭১ সালে। আমরা পারিনি সে সুযোগ কাজে লাগাতে। পারিনি সেই আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে। পারিনি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। উপরন্দ পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম পিছিয়ে পড়া এক জাতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছি। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, তবুও ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র আমরা বাঙ্গালীরা পৃথিবীর গতিপথে স্বতন্ত্র সত্তায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি আমরাই আবার একদিন সক্ষম হবো সমস্ত পিছিয়ে পড়াকে রাহুমুক্ত করে এগিয়ে যেতে।

২৮

মাগুরা পাড়ি দিতেই দুপুর গড়িয়ে গেলো। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ আমি নাকোল পৌঁছে গেলাম। নাকোল বাজার এড়িয়ে ওয়াপদা ক্যানেল পার হয়ে গ্রামে ঢুকে গেলাম। ইচ্ছে করে বাজারের দিকে গেলাম না। যেতে মন চাইলো না। বাজারটা এমনভাবে ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে যে, তাকানো যায় না। তারপর আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে তখন বাজারের পাগলটাকে বর্বর পাকিস্তানীরা জ্বলন্ত আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মেরেছে। পাগলটা সারাক্ষণ জয় বাংলা স্বাধীন বাংলা শেখ মুজিব বলে মাতম করতো আর রাজাকার মিলিটারী দেখলে হাতের কাছে যা পেতো তাই নিয়ে ধেয়ে যেতো।

কামারখালী ঘাট পাড়ি দিয়ে মাইল দুই মাগুরার দিকে গেলে ওয়াপদা মোড়। এখান থেকে যে রাস্তাটি নাকোল শ্রীপুর লাঙ্গলবাঁধ হয়ে শৈলকুপা পর্যন্ত গেছে তা ওয়াপদা ক্যানেলের এক ধার ঘেঁষে চলে গেছে। রায় নগর ও নাকোল গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে এই রাস্তাটি স্থানীয় জনগণ পাকিস্তান বাহিনীর গতি রোধ করার জন্য অন্তত ১০ ফুট গভীর করে কেটে ফেলেছিলো। জুন মাস পর্যন্ত এ রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি যেতে পারেনি। তারপর একদিন রাজাকার মিলিটারী গ্রাম ঘিরে লোকজনকে গুলির মুখে বাধ্য করে খননকৃত খাদ ভরাট করে দিতে। একজনকে জনসমক্ষে গুলি করে হত্যা করে। অন্যেরা আর কোন কথা না বলে নীরবে রাস্তা বেঁধে দেয়।

এখন এ এলাকায় মুক্তিবাহিনীর 'কেচকি' মার শুরু হয়ে গেছে। একদিকে শ্রীপুর ক্যাম্পের (শ্রীপুর থানা) কমান্ডার আকবর হোসেনের আকবর বাহিনী অন্যদিকে গড়াই নদীর ওপার ডুমাইন ক্যাম্পের মুক্তিবাহিনীর মারের চোটে মুক্তি নাম শুনলে রাজাকার তো কোথাকার, মিলিটারী পর্যন্ত ভয়ে চমকে ওঠে। ভয়ে কেউ ভেতরে প্রবেশ করে না। বড় সড়ক বা হাটবাজার এলাকা ছেড়ে কেউ আর নিচেই নামতে সাহস পায় না। তারপর

কোনোরকম সহযোগিতা জনগণ থেকে পায় না। ওরা আসছে শুনলে জনগণ এলাকা ছেড়ে সরে পড়ে। মানুষের কষ্ট হয় ঠিকই কিন্তু এটা একটা মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। এতে মুক্তিবাহিনীরও ওদের কাউন্টার দিতে সুবিধা হয়। সাধারণ মানুষ যে কতভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছে তা বর্ণনাতীত।

রাতেই রেজা সাহেবের সাথে কথা হলো। এক সাথে বসে রেডিও শুনলাম। শুনলাম বয়রা চৌগাছা সীমান্তে মুক্তিবাহিনী দারুন ফাইট দিচ্ছে। ঐ এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর ঘাঁটিও খুব শক্ত। রেজা মাস্টার বল্লেন, যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাকিস্তানীদের দুর্গ বলা যায়; কাজেই ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনীর সুবিধা করা কঠিন হবে যদি না ভারত বড় ধরনের সহযোগিতা করে। বল্লাম, শুনেছি যুদ্ধের জন্য ভারত বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড গঠিত হতে যাচ্ছে। আর তাই যদি হয় তবে পাকিস্তানীদের হটানো কোন ব্যাপারই হবে না।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। কামারখালী ঘাট পর্যন্ত পৌছতে সকাল ১০টা বেজে গেলো। অনেক পথ হেঁটে যেতে হলো। ঘাট পার হলাম। থরে থরে আর্মি সাজানো। রাজাকাররা আছে সহযোগিতায়। বেশ কিছু লোক এক সাথে পার হতে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হলো আমাদের। আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখছে এক এক করে। মুক্তিযোদ্ধাদের যে চেহারা, তা দেখলেই বোঝা যায়। এটা আমিও বুঝি। তাই আমি খুব স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করছি। ব্যাগে কি জানতে চাইলো, তাড়াতাড়ি ব্যাগের মুখ খুলে দেখিয়ে দিলাম ব্যবহারিক কাপড়-চোপড়। এখন মনে হয় একটু বেশী তাড়াহুড়া করে ফেলেছিলাম, যেটা বিপদের কারণ হতে পারতো। ভালোভাবে চেক করলে জয় বাংলা পত্রিকার সৌজন্যে মৃত্যু অবধারিত ছিলো সেদিন।

ছেড়ে এলাম কামারখালী। এই কামারখালী লাগোয়া বলে ডুমাইন-মুক্তিবাহিনী একটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে তারা একাধিকবার মুখোমুখি হয়। সর্বশেষ ১০ ডিসেম্বর ডুমাইন হরিপদ খাল এলাকায় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় পাকিস্তানীদের সাথে। সেই যুদ্ধে শহীদ হন মফিজ, খলিল যাঁদের নাম আগেই বলেছি। ছেড়ে গেলাম নাকোল ডুমাইন কামারখালী এলাকা। পরে যখন ফিরে আসি তখন আমরা যুদ্ধে জয় করেছি। তখন আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

মানিকগঞ্জ যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। শহরে নিষ্প্রদীপ মহড়া চলছে। একটা ভীতিকর অবস্থা। এর মধ্যে যেয়ে কড়া নাড়লাম টুকুর বাসায়। নাম বলার পরে বুলবুল এসে দরজা খুলে দিলো। টুকু আলো আড়াল করে মোমবাতি হাতে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়ানো। আলো একটু ছেড়ে দিয়ে আমাকে দেখে বলে উঠলো, ও, তুমি ! তাই তো বলি, এই সময় মরণে আর কারে তাড়া করে আনবে। বুবুও বের হয়ে আসলেন। চোখে মুখে আতঙ্কভাব। দেখি টুকুর ছোট বোন শিউলিও এখানে। বড় বোন টুকুর পেছনে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে দেখে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। ওর ধারণা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে দারুন আগ্রহ তার। ছোট্টবেলা থেকেই সে খুব গল্প শুনতে পছন্দ করে। গল্প ফুরিয়ে গেলে বলতো, আবার বলেন।

এক কথায় জবাব দিলে হলো না। যাত্রাপুরের বিস্তারিত খবর বলতে হলো। ভাইকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই, বরং যারা শহরে আছে তাদের নিয়ে তিনি চিন্তিত। বল্লাম, তোমাদেরকে সাবধানে থাকতে বলেছেন। শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে বলেছেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কোন অবস্থায় যেন শহরে না থাকা হয়।

পরদিন সকাল সকাল ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম। বিষণ্ন মনে হাত নেড়ে ওরা আমাকে বিদায় দিলো। টুকুও কোন কথা বললো না, শুধু চেয়ে রইলো। ফেরি পারাবার দ্রুততার সাথে চলছে। ফেরির সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে চারদিকে।

নয়ারহাট ফেরিঘাটে থেকে চারজন সশস্ত্র রাজাকার বাসে উঠে পড়লো। দুইজন লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরা লোক সাথে। আগেই বলেছি, রাজাকাররা হিংস্র হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হলো, এরা মানুষ খুন করে এসেছে, আবার মানুষ খুন করতে যাচ্ছে। সাথে ঐ দুইজন যেন ওদের গাইড হিসেবে কাজ করছে। মাঝে মধ্যে রাজাকারদের ওরা পান সিগারেট যোগান দিচ্ছে। বাস ভাড়াও তারা দিতে গেলে রাজাকাররা বললে, তাদের ভাড়া দিতে হবে না। বাস কন্ডাকটারও আর ভাড়া চাইতে সাহস করলো না। বাসের অন্য যাত্রীরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেলো। রাজাকার ও ঐ দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একজন বলে উঠলো, জয়বাংলা যারা করবে তাদের এদেশে জায়গা নেই। জয় বাংলা করবি তো বাবাদের দেশে চলে যা। এদেশে ঐ সব চলবে না।

কান পেতে বসে আছি, চোখ মেলে চেয়ে আছি। চোখের সামনে ভেসে উঠছে লক্ষ জনতার মিছিল। তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।

রাজাকাররা সঙ্গী দুইজনসহ নেমে গেলো সাভারের কাছে এক গ্রাম্য রাস্তার মোড়ে। আমরা যাত্রীরা সেদিকে চেয়ে রইলাম। থু করে খানিক থুথু সশব্দে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। বাস মিরপুর পৌঁছে গেলো। মিরপুর লোহার ব্রিজ হেঁটে পার হয়ে এসে বাসে উঠলাম। বাস ভর্তি লোক। দেরী করা ঠিক হবে না মনে করে বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে রওনা দিলাম। যাত্রীরা বেশীর ভাগ অবাঙ্গালী। ওদের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। কলেজ গেটে বাস থামতেই আমি নেমে গেলাম।

ঢাকায় পৌঁছে মনে হলো আমি যেন যুদ্ধ জয়ের বার্তা বহন করে এনেছি। আসলে এনেছি জয় বাংলা পত্রিকার দুটি কপি মাত্র।

শান্তিনগর বাসায় যেয়ে দেখি বাসা খালি। মনা ভাই চাকরীস্থলে। অন্যদেরকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মানিকগঞ্জ, মেয়ের বাসায়। কাজের ছেলেটা আমাকে দেখে খুব খুশি। বল্লাম, দেখে আয়তো ঐ চায়ের দোকানটা খোলা আছে কিনা। সাথে সাথে চলে গেলো এবং ঘুরে এসে বল্লে, খোলা আছে। আমি আর দেরী না করে চলে গেলাম। আগের মত এক টাকার গুঁড়ো চা কিনে দোকানে রেখে এলাম জয় বাংলা পত্রিকা। দ্বিতীয় কপিটিও

আগের মতো একইভাবে সন্ধ্যার দিকে বাস থেকে ফেলে দিলাম মগবাজার মোড়ে। শরীর মন হালকা হয়ে গেলো। দোকানে বসে এক কাপ চা খেয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে বাসায় ফিরে এলাম। এই শেষ আর ঢাকার বাইরে যাওয়া হলো না। যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো।

ঢাকা শহরে লোকজনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ২৫শে মার্চের পরে যারা শহর ছেড়েছিলো তার একটা অংশ ফিরে এসেছে। অফিসের চেয়ার টেবিল খালি খুব কম। সবাই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। প্রতিদিন শহরে মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন চালাচ্ছে বিভিন্ন স্থাপনার ওপর। প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটছে। রিক্সা চালিয়ে চলে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা, অথচ মুক্তিবাহিনীর লোককে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। রীতিমত উত্তেজনাকর ব্যাপার! সাধারণ মানুষের সাথে মিশে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা কাজ করে যাচ্ছে। পাকিস্তানী প্রশাসন দিশেহারা হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানী আর্মি পুলিশ মিলিশিয়া এদের ধরতে পারছে না। তারা সবই আদমী চোখে দেখছে। 'মুক্তি কিধার হায়'—এ রকম অনেক কথা বাজারে ছড়িয়ে গেছে। ঢাকা রেডিও মানুষ শোনে না। রেডিওর মধ্যে নানা-নাতিনের অশ্লীল ব্যঙ্গের দিন শেষ হলেও তখনো মুক্তিযোদ্ধাদের ওরা অনুপ্রবেশকারী বলে। স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসির খবর বুকে রেডিও জড়িয়ে ধরে শোনে মানুষ। দেখলাম এক ধরনের রাজাকার বাড়ি বাড়ি ঢুকে সকলকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলা বেতার শোনা যাবে না। যে শুনবে তার বিপদ হবে। একদিন সন্ধ্যার দিকে ৪/৫ জন এক সাথে বাসায় আসলো। এদের চেহারা এতদিন যে সব রাজাকার দেখেছি তাদের মতো নয়। মুখে দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবী, কারো কারো মাথায় টুপিও আছে। বল্লে, এ বাসায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনা হয় বলে আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। আমিই যেন এ বাসার প্রধান এমন ভঙ্গী করে বল্লাম, ঠিক আছে আর যাতে না শোনা হয় সে ব্যবস্থা করা হবে। তারা চলে গেলো। কিন্তু পরে ঘন ঘন আসতে লাগলো। এ বাড়ির নাম শচীবাস আগেই বলেছি। শচীনবাবু নামে এক জমিদারের ছিলো এই বাড়ি। দোতলা খাস কামরা, শান বাধানো পুকুর, গাছপালা, কর্মচারী-চাকর-বাকরদের থাকার জন্য সারিবাধা ঘর সবই আছে। বাড়ির দক্ষিণ দিক দিয়ে পগার কাটা (বড় ড্রেনের মতো)। কয়েকজন এই বাড়ির মালিক। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের এক অংশের মালিক মনা ভাই, এ কথা আগেই বলেছি। বাড়ির এই অংশটা মূল কোটা বাড়ি থেকে আলাদা। পুব দুয়ারী চার কামরার সেমি পাকা ঘর, ভেতর দিকে মুলি বাঁশের বেড়া।

ভেতরের মূল কক্ষে অর্থাৎ মনা ভাই-ভাবীর শয়ন কক্ষে যেয়ে দেখি আলমারীর ওপরে এক কার্টন ভর্তি বন্দুকের গুলি। বিছানার গদি উঁচু করে দেখি বন্দুকটিও সেখানে। বন্দুকটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকি। তারপর এক সময় গুলির প্যাকেট নিচে নামিয়ে বন্দুক লোড করে ফেলি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, আজই এটা ব্যবহার করবো রাজাকারদের বিরুদ্ধে। আমি হয়তো উত্তেজনার বশেই এটা করেছিলাম। স্বাভাবিকভাবে দেখলে এটাকে হটকারিতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বোঝা গেলো

আমি না হয় সেদিন রাজাকারদের দিকে গুলি ছুঁড়লাম, তারা মারা পড়লো কিংবা পড়লো না, তারপর কি হবে? আমার এসব তখন মাথাতেও আসেনি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বন্দুক কিভাবে চালাতে হয় তা আমার জানা ছিলো। আমার আত্মীয় ইসরাফ আলী খান যাঁকে নকসালরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাঁর কথা আগেই বলেছি। তাঁর এমন একটা একনলা বন্দুক ছিলো। তিনি পৈতৃক সূত্রে বন্দুকটি পান। আমাদের পাশাপাশি বাড়ি। তিনি আমাকে ছোটবেলায় খুব স্নেহ করতেন। আমাকে স্নেহ করার কারণও আমি আগে বলেছি। আমার কাজ ছিলো কোথায় পাখি পড়েছে এই খবর তাঁকে পৌঁছে দেওয়া। এই কাজটা আমি মহাআনন্দে করেছি আমার সেই কৈশোর বয়সে। তিনি পাখি শিকার করতে যাবার সময় আমাকে সস্নেহে ডাক দিয়ে নিতেন। ডাকা মানে তাঁকে বন্দুক ঘাড়ে দেখলেই আমি সাথী হয়ে গেছি। আর পাখি পড়ার খবর যদি এনে দিতে পেরেছি তা হলে তো কথায় নেই। খবর পেয়ে লম্বা মানুষটা যখন জোরে জোরে হাঁটা শুরু করতেন আমি পেছনে পেছনে দৌড়ে কুল পেতাম না।

তখন কাজটা মহাআনন্দে করলেও পরবর্তীকালে অন্তত এক দিনের ঘটনায় আমার মনে হয়েছে আমি অন্যায় করেছি।

মনে পড়ে শীতের প্রারম্ভে একদিন সকালের দিকে বিলের ধারে বড় মান্দার গাছটার ওপর এক জোড়া বড় সারস পাখি বসে থাকতে দেখে আমি দৌড়ে এসে খবর দিই। খবর পেয়ে তিনি ছুটলেন পেছনে পেছনে আমিও। তারপর গুলি খেয়ে একটা পাখি পড়ে গেলো প্রায় গাছের নিচেই। আর একটা পাখি তাৎক্ষণিকভাবে উড়ে গেলো ঠিকই, কিন্তু কিছুদূর যেয়ে সে আবার ফিরে এলো। বার বার সে ঐ গাছটা কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে আর কেমন করে ডাকতে থাকে। আমার মনে হলো পাখিটি যেন কাঁদছে। এর জন্যে নিজেকে আমার অপরাধী মনে হয় এবং এখনো হয়।

কাজেই গুলিহীন বন্দুক নেড়েচেড়ে দেখতে আমার কোন বাধা ছিলো না। কিভাবে গুলি করতে হয়, কিভাবে বন্দুকের নলের মাথার 'মাছি' বরাবর নিশানা ঠিক করতে হয় তা আমার সেকালেই জানা।

সন্ধ্যার দিকে ওরা সাধারণত আসে। আমি সন্ধ্যার আগেই দক্ষিণ দিকের ঐ পগারের ধারে ঝোপের আড়ালে যেয়ে পজিশন মত বসে পড়ি। সঙ্গে এক কার্টন গুলি আর একটি বন্দুক। পগারটা বাংকারের মতো, প্রয়োজনে ওদিক দিয়ে চলে যাওয়া যাবে। তখন যে এখানে একটা ঝোপ ছিলো একথা এখন আন্দাজ করাও কঠিন। কিন্তু দুভার্গ্য আমার, সেদিন রাজাকাররা এলো না। পরের দিন মনা ভাই এসে পড়লেন। ভাবী সাহেবাও ছোট ছেলেকে নিয়ে এসে পড়লেন মানিকগঞ্জ থেকে ঐদিনই। এসেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন এ বাসায় আর থাকা নিরাপদ নয়। যুদ্ধ অত্যাসন্ন। এখান থেকে রাজারবাগ খুব কাছে, কাজেই যুদ্ধ শুরু হলে এটা হবে বিপজ্জনক এলাকা। ক্যান্টনমেন্টের পরেই রাজারবাগ আর পিলখানা, যেখানে বোমা পড়বে। মনা ভাই সারা দিন ব্যস্ত থাকলেন। পরের দিনই সকাল বেলা

আমরা বড় মগবাজার রেল লাইনের ধারে এখনকার ২০২ নং বাড়ির দোতলায় উঠে গেলাম। হাতে নেয়া যায় এমন কিছু মালপত্র ছাড়া আর কিছু নেয়া হলো না। প্রয়োজনও ছিলো না।

বাড়ির মালিক জনাব হাসান সাহেব মনা ভাইয়ের মেয়ের শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আত্মীয়। তিনি পরিবার-পরিজনসহ গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন। বাসায় আছেন তাঁর ভগ্নিপতি মুজিবুল হক সাহেব। মুজিবুল হক সাহেব জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক। আমরা এক সাথেই থাকলাম। অধ্যাপক সাহেব দেখতে যেমন খাটো, তেমনি আবার সামান্যতেই ভয় পেয়ে যান। কিন্তু হাসি খুশি স্বভাবের বেশ মজার মানুষ তিনি। বিড়ি সিগারেট টানারও অভ্যাস আছে।

২৯

ছোট বড় দুটো রেডিওই শান্তিনগর থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছি। বড় রেডিওটা বাইরের ঘরে সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়ে ঢাকা স্টেশন ধরে রাখি। খবরাখবর যা শোনার তা ছোটটাতে শুনি। শান্তিনগরের মত ঘটনা এখানেও ঘটবে তাই আগেই ব্যবস্থা নেয়া ভালো। পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে এক শ্রেণীর মানুষের ধড়ফড়ানি আমি দেখেছি। এই মুহূর্তে তারা মানুষ খুন করতে দ্বিধা করবে না। তাদের হাতে এখন মানুষ খুন করার অবাধ সার্টিফিকেট।

আকাশবাণী ঘোষণা দিলো প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় জনসভায় ভাষণ দেবেন। সেদিন ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ। আমরা সবাই জড়ো হয়ে বসে গেলাম। মনা ভাই, প্রফেসর সাহেব, আমি ও আমার এক বন্ধু গাজী সাহেব আর একজন নিচতলার বাসিন্দা। তিনি আমার সমবয়সী হবেন, পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক, লন্ডনে থেকে সিএ পড়েন। ঢাকায় বেড়াতে এসে আটকা পড়েছেন। আমরা যারা বসে আছি সবার মোটামুটি একই ধারণা, ভারত আজ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবে। কাজের ছেলেটাকে বাইরে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ আসলে খবর দেবে বলে। এ ব্যবস্থা প্রফেসর সাহেবের।

তাঁর একই কথা, আমি বাংলার শিক্ষক, আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। কাজেই কাউকে আসতে দেখলে বা কোন শব্দ হলে তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর লেদার স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। বাথরুমকে তিনি নিরাপদ স্থান মনে করেন।

প্রফেসর সাহেবকে নিয়ে সেই কঠিন দিনেও আমরা কত হেসেছি! পরে অবশ্য বুঝেছি বাংলার শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভয় পাওয়ার মধ্যে কত দূরদর্শিতা ছিলো।

ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শুরু হয়ে গেলো। চারদিকে পিন পতন নীরবতা। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মতো গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলাম প্রতিটা শব্দ। এর পরে কি বলেন, তার পরের বাক্যে কি বলেন, শুনতে শুনতে আমরা একে অপরের দিকে তাকাই। তিনি বললেন, আমাদের প্রতিবেশীদের এই চরম দুর্দিনে আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। তাদের জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন আমরা তা করে যাবো। কিন্তু স্বীকৃতির কথা তো আসে না। বক্তৃতার এক পর্যায়ে বোঝা গেলো বক্তব্যের প্রয়োজনে তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট কারো কাছে গলার স্বর নিচু করে জানতে চাইলেন, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কত। তারপর .সংখ্যাটা জেনে নিয়ে আবার তিনি স্বাভাবিক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। তাঁর এই জানতে চাওয়াটা রেডিওতে বেশ ভালভাবেই শোনা গেলো, এতে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। যাঁর দিকে চেয়ে আছে সাড়ে সাত কোটি মানুষ, যিনি বিশ্বব্যাপী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন, আমাদের স্বাধীনতার জন্যে যিনি আমাদের এক কোটি মানুষের আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, তিনি কি করে জানেন না এখানে লোকসংখ্যা কত ? নিজের ক্ষুদ্রতার জন্যে কষ্ট পেতে লাগলাম। আমার কাছে সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইন্দিরা গান্ধী বলেই হয়তো এমন মনে হয়ে থাকবে। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলো। ঐ ভাষণে বাংলাদেশের স্বীকৃতি না আসায় আমরা খুবই হতাশ হলাম।

রাত আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে আকাশবাণীর খবরে জানা গেলো পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মনা ভাই বললেন, পরিস্থিতি এবার জটিল হয়ে যেতে পারে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে চালিয়ে দেবার একটা কূট চাল হতে পারে পাকিস্তানের। এমনও হতে পারে কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে আসবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তথা কোন পরাশক্তি। তবে তিনি এও বললেন, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইতোমধ্যে মৈত্রী চুক্তি করে নিজের রাস্তা শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। নিচতলার লন্ডনী ভদ্রলোকও বললেন, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যেতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী এখন তাঁর নিজের ঘর সামাল দেবেন, না আমাদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসবেন। এ সব কথাবার্তার মধ্যে নিরেট অন্ধকারে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। নিষ্প্রদীপ মহড়ার মধ্যে সারা রাত ধরে থেমে থেমে প্রচণ্ড শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

সকাল বেলা দেখা গেলো ভিন্ন দৃশ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান সাদা সাদা বিমান নির্মল আকাশে সকালের রোদে চিক চিক করতে লাগলো। মানুষ যেন অন্ধকার গুহা থেকে আলোর মুখ দেখলো। আকাশবাণী বিবিসি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জানা গেলো ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী যশোর কুমিল্লা সিলেট ময়মনসিংহ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে বীরদর্পে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে। এদিকে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী এ অঞ্চলে শেষ। একদিনেই বিমান বাহিনী কুপোকাত। ঢাকায় এখন মানুষের দৃষ্টি আকাশে। সাদা

সাদা ভারতীয় বিমান উড়ে আসে অনেক ওপর দিয়ে আর নিচ থেকে এন্টিএ্যায়ার ক্রাপটগুলো অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকে। পাকিস্তানের ২টা সেভার জেট প্লেন সকালের দিকে নিচু দিয়ে এক সাথে পূর্ব দিকে উড়ে যেতে দেখলাম। এই শেষ। আর কোন পাকিস্তানী প্লেন আকাশে ওড়েনি। মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কেউ ছাদে, কেউ রাস্তায়।

৬ তারিখে ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিলো। ঘরে ঘরে সে কি নিরব আনন্দ! মনা ভাই বললেন, এবার স্ট্রাটেজি পাল্টে গেলো। এখন আর কেউ আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বলে চালিয়ে দিতে পারবে না। লন্ডনী ভদ্রলোকও মনা ভাইয়ের সাথে একমত হয়ে বললেন, এবার পাকিস্তানের আর কোন কূটনীতি খাটবে না। আমরা সবাই খুব আনন্দিত। মনে করলাম আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। একই অবস্থা চলতে থাকলো ঢাকার আকাশে। ভারতীয় বিমান সাঁ করে উড়ে আসে আর নির্দিষ্ট স্থানে বোমা ফেলে ফিরে যায়। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এ দৃশ্য চলতে থাকে, আর সারা ঢাকা শহরের মানুষ ছাদে দাঁড়িয়ে তা আগ্রহভরে দেখতে থাকে। বিমানগুলো এন্টিএ্যায়ার ক্রাফটের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি উপেক্ষা করে প্রচণ্ড গতিতে বোমা ফেলে চলে যায়। কখনো আবার কোনোটা গুলি খেয়ে পড়েও যায়। সকালের দিকে দেখলাম বোমা বর্ষণ করে উঠে যাবার সময় একটা প্লেন আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে একখানা পাখা খুইয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে ঢাকা শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আজকাল যেমন ভিডিও গেমসে ছেলেমেয়েরা যে ধরনের খেলা দেখে থাকে, একাত্তরের ডিসেম্বরে তা বাস্তবে দেখেছে এ দেশের মানুষ।

৬ তারিখে দুর্গসদৃশ যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাকিস্তানীরা নিজেরায় মুক্ত করে দেয়। এ কথা আমরা পরের দিন ৭ তারিখ বিবিসির আকাশবাণীর খবরে জানতে পারি। তার আগে চৌগাছা এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। যুদ্ধের পরে জেনেছি, অনেকদিন ধরে ঐ এলাকার বাসিন্দারা ভয়ে বাড়ি ঘরে প্রবেশ করেনি। আখের ক্ষেতে মাঠে ঘাটে অসংখ্য লাশ ছিটিয়ে থাকতে দেখেছে মানুষ। কত মানুষ যে পরে পুঁতে রাখা মাইনে মারা গেছে তার হিসেব কেউ রেখেছেন কিনা আমার জানা নেই! জলপাই রংয়ের ছোট ছোট কনটেনার আজও ঐ এলাকায় খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যাবে।

ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয় এই সময়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে দিয়ে পাক বাহিনী ঝিনাইদহ মাগুরা ও খুলনার দৌলতপুরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যুদ্ধের সাথে সাথে এগিয়ে চলে কূটনৈতিক তৎপরতা। ৭ তারিখে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আকাশবাণীর মাধ্যমে আমরা এসব খবর জানতে পারি।

৭-৮ তারিখে মাগুরায় যৌথ বাহিনীর সাথে পাকিস্তান বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই হয় এবং সেই সাথে ভেঙ্গে পড়ে পাকিস্তানীদের এতদঞ্চলের সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এই পথে যৌথ বাহিনীর সামনে ঢাকার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে আর কোন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি পাকিস্তান বাহিনী।

বর্বর পাকিস্তানীরা মাগুরা পিটিআই চত্বরে তৈরি করেছিলো শক্তিশালী বাংকার। তৈরি করেছিলো গণকবর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মাগুরার এই গণকবরের কথা এ দেশের হাজারো গণকবরের মতো বিলীন হয়ে গেছে। বাংকারের ইটগুলো খুলে নিয়ে গেছে মানুষে। শোনা যায় পিটিআই-এর ইমারত নির্মাণ কাজে ঐ ইটও ব্যবহার করা হয়েছে। গণকবর মিশিয়ে দেয়া হয়েছে মাটির সাথে। এর সংরক্ষণের কথা কেউ ভাবেনি। এই গণকবরে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে অনেকের সাথে এলাকার টেংরা মিয়াকে যার খবর কেউ রাখেনি। পার্শ্ববর্তী কোনো এক গ্রাম থেকে তাকে ধরে এনেছিলো রাজাকাররা। মাগুরা পিটিআই পার্শ্ববর্তী ২/১ জন আমাকে এ কথা বলেছে।

৮ তারিখে যৌথ বাহিনী চতুর্দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে ঢাকার দিকে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের পথে সর্বাগ্রে যারা ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে তাদের সঙ্গে ছিলো কাদেরীয়া বাহিনী। ৮ তারিখেই ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেক'শ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালেন। আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র হতে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতে ক্রমাগত ঘোষিত হতে থাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান। ঘোষণায় বলা হয়, আত্মসমর্পণ করলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতি জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক সম্মানজনক আচরণ করা হবে। তারপর চলতে থাকে ক্রমাগত ঘোষণা: আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের বাঁচার আর কোনো পথ খোলা নেই। ঢাকা শহর এখন সকল দিক দিয়ে আমাদের হাতের মুঠোয়। আত্মসমর্পণ না করলে ঢাকা শহর মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে বিমান হামলাও চলতে থাকে নিপুণভাবে। কিছুক্ষণ গভর্নর হাউজের ওপর আক্রমণ চালায়, আবার কিছুক্ষণ পিলখানায়। অন্য দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ওপর তো আছেই। কখনো আবার রাজারবাগে মিগগুলো একটার পর একটা উড়ে আসে আর দর্শনীয়ভাবে আঘাত হেনে ওপরে উঠে যায়। মানুষ ছাদে দাঁড়িয়ে রুমাল দেখিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে এই আক্রমণকে অভিনন্দন জানায়। বিমান থেকেও অভিনন্দনের জবাব দেয়া হয় বিমানের দুই দিকে আলো জ্বেলে জ্বেলে।

তখনো পাকিস্তানীদের ঘাড় ফোলানো ভাব যায়নি। তারা ছাদে ওঠা নিষেধ করে দিলো। কাউকে ছাদে দেখা গেলে গুলি করা হবে বলে জানিয়ে দিলো। মহল্লায় মহল্লায় গ্রুপ গ্রুপ পাকিস্তানী ও তাদের দোসররা ছাদে উঠে গেলো রাইফেল কাঁধে নিয়ে। এর মধ্যে ঢাকায় নাপাম বোমা ফাটানো হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে গেলো। কর্কশ বায়ু অনুভূত হতে লাগলো। মনে হলো বাতাস জলীয় বাষ্পহীন হয়ে যাচ্ছে। পরে অবশ্য এ বিষয়টি নিয়ে আর কখনো কোন কথা শোনা যায়নি। গুজবও হতে পারে, তবে তারিখটা সঠিকভাবে মনে করতে না পারলেও সেদিনের সকাল নয়টার দিকের সেই অনুভূতিটুকু এখনো আমার স্মৃতিতে সজাগ হয়ে আছে। হয়তোবা সেটা বারুদের গন্ধ হয়ে থাকবে।

১১ তারিখে ঢাকার পরে কোনো বিমান আক্রমণ হলো না। জানা গেলো এই ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশীদের সরিয়ে নেয়া হবে। এতে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ইতোমধ্যে সব বাড়িতে মহল্লায় ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়ে গেছে। আমরা কয়েকজন মিলে আমাদের উপযোগী

করে একটি ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেল্লাম, যদি পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ না করে তবে ঢাকা শহর গুঁড়িয়ে যেতে বেশী সময় লাগবে না। অগত্যা এই ট্রেঞ্চে ঢুকে যতোক্ষণ বেঁচে থাকা যায়।

১২ তারিখে আবার আগের মতো চললো বিমান আক্রমণ। একেবারে নিশানা মাফিক আক্রমণ। সাধারণ মানুষের ওপর একটি আঁচড়ও পড়লো না। মানুষ বলতে লাগলো, নিয়াজী যেখানে যাচ্ছে সেখানেই বিমান আঘাত হানছে। গোয়েন্দা বাহিনী শক্তিশালী সার্ভিস দিচ্ছে। এর মধ্যে জানা গেলো শহরের সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (এখন হোটেল শেরাটন) আশ্রয় নিয়েছেন। এতে আমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তা আর কারো ব্যক্ত করার অপেক্ষা রইলো না। তার ওপরে ব্লাক আউট চলছে। অন্ধকারে পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

৩০

মগবাজার ওয়ারলেস, এখন যেখানে রাসমোনো ক্লিনিক, তার পেছন দিকে রেল লাইনের ধারে দোতলা একটা বাড়িতে আমরা থাকছি একথা আগেই বলেছি। সকাল ৯ টার দিকে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা গেলো। প্রথমে কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু পরে দেখি, সশস্ত্র কয়েকজন লোক টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের এক লোককে। বাড়িসুদ্ধ লোকজন তাকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর সশস্ত্র লোকেরা রাইফেল-বুটের আঘাতে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে। সাথে কয়েকজন সিভিল লোকও আছে। তারপর ঢুকলো পাশের বাড়িতে। বুঝলাম ওরা ঘরে ঘরে অপারেশন চালাচ্ছে যাকে খুশি ধরে নিয়ে যাচ্ছে অথবা নির্দিষ্ট কাউকে ধরার জন্যে এই তাণ্ডব শুরু করেছে। এখন যে বাড়িতে ঢুকেছে তার পরেই আমাদের বিল্ডিং।

ওদের বর্বরতা অন্যান্য মহল্লাতেও শুরু হয়ে গেছে। মনা ভাই তাঁর বন্ধু হাকিম সাহেবের বাসায় ছিলেন। হাকিম সাহেব ওয়াপদার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। সেখানেও এই অবস্থা দেখে মনা ভাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসেছেন। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে ভেতরের দিক থেকে সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে দুই বন্ধু পথ করে নিয়েছিলেন।

আমি সেদিন সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনা ভাই এই সময় এসে গেইটে নক করবেন এটা ভাবতেই পারিনি। আমি ভেবেছি ওরা এসে গেছে, বাঁচার আর কোন পথ নেই। বেশ কয়েকবার যখন জোরে জোরে বলেছেন, আমি মোকাব্বের, তখন আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছি এবং এগিয়ে যেয়ে গেইট খুলে দিয়েছি।

তার কিছুক্ষণ পরই ওরা যখন গেইটে এসে গেলো। মনা ভাই এগিয়ে গেলেন। মনা ভাই দেখতে যেমন সুপুরুষ, গায়ের রং তেমন টক্‌টকে ফর্সা। তার ব্যবহারও তেমন অমায়িক। আমি লক্ষ্য করলাম মনা ভাইয়ের সাথে কয়েকটা কথা বলার পর তারা চলে গেলো।

ওরা চলে যাওয়ার পর মনা ভাই ভেতরে ঢুকলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রফেসর সাহেব বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলেন। মনা ভাই বেরিয়ে যাবেন—ভাবীজান এসে সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি এখন বাইরে যাবে না। এই অবস্থায় বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। কিছু সময় অপেক্ষা করো।

পরে ঐ বাড়ির খবর নিয়ে জানতে পারলাম যাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওরা যখন বুঝতে পাবে, যাকে ওরা ধরতে চায়, এই লোক সেই লোক নয়, তখন তাকে ছেড়ে দেয়।

১৫ তারিখে আমরা ট্রেঞ্চে ঢোকার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। অবরুদ্ধ ঢাকা আর বেশী সময় এভাবে থাকতে পারে না। বিশ্ববাসীর দৃষ্টি এখন ঢাকার দিকে। জাতিসংঘে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে দু'বার ভেটো প্রয়োগ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। কাজেই আর বিলম্ব করা যায় না, যতো দ্রুত সম্ভব ঢাকাকে ফল করাতে হবে। এটাই এখন স্বাভাবিক। আত্মসমর্পণের বার্তাসম্বলিত মুদ্রিত লিফলেট প্লেন থেকে ছাড়া হতে লাগলো সারা শহরে।

দুপুর হয়ে এলো। রেডিওতে পূর্বের ঘোষণা অব্যাহত রেখে চরম ঘোষণা দেওয়া হলো, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। একবারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, অন্যথায় চরম পরিণতি অনিবার্য। সময় এগিয়ে চলেছে পলে পলে। বিকালের দিকে আমরা দেখতে পেলাম মিলিটারী ভর্তি একখানা ট্রেন সবুজ ডালপালা দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে কোনো দিক থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গেলো। ট্রেনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছে অসংখ্য মেশিনগানের মুখ। খুব ধীর গতিতে এক প্রকার নিঃশব্দে চলে গেলো ট্রেন ভর্তি মিলিটারী। এটাই আত্মসমর্পণের পূর্বাভাস এই ধারণা নিয়ে ১৫ তারিখের সেই বিভীষিকাময় রাত আমাদের কেটে গেলো।

ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। ২৪ ঘণ্টা পূর্তির আর বেশী সময় বাকী নেই। যে কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে ধ্বংসযজ্ঞ।

এরই মধ্যে গাজী সাহেব এসে খবর দিলো, পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করবে বলে ঘোষণা হয়ে গেছে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে।

খবরটি শুনে সেদিন যেমন কোনো কথা বলতে পারিনি। ২৬ বছর পর আজও জীবনের স্মরণীয় সেই মুহূর্তটির কোনো বর্ণনা দিতে পারলাম না। আমার সে অনুভূতিটুকু একান্ত আমারই রইলো।

রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশে গাজী সাহেবসহ এগিয়ে যাচ্ছি। ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে মহাবিজয়ের মহাউল্লাস। বিজয় পতাকা উড়িয়ে ঢুকে পড়েছে মুক্তিসেনার দল। বেরিয়ে

পড়েছে মুক্তিপাগল মানুষ। মুক্ত কণ্ঠে আওয়াজ উঠেছে, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। জ-য়-বা-ং-লা।

চারদিকে ছড়িয়ে গেলো নতুন দিনের আলো। এর মধ্যেই মরণ কামড় দিলো বিভিন্ন স্থাপনায় পাহারারত সশস্ত্র পাকিস্তানীরা। আত্মসমর্পণের খবর যখন তাদের কাছে পৌছে তখন তাদের আর পালাবার পথ নেই। এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে চালাতে ওরা ক্যান্টনমেন্টের দিকে পিছু হটতে থাকে। বিজয়ের এই চরম মুহূর্তেও আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক প্রিয়জনকে ওদের ঐ গুলিতে। তার মধ্যে অন্তত একজনের নাম এখানে বলে রাখি যার নাম ডোরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ছিলো সে। ঘটনাক্রমে সে ছিলো আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

বেলা তিনটার দিকে আমরা যখন রেসকোর্স ময়দানে পৌছলাম তখন হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি সেখানে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তারা প্রত্যক্ষ করছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার ও খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ এ খান নিয়াজীর আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দৃশ্য। আত্মসমর্পণ করছেন ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডার ইন চিফ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে। কেটে গেলো আরো কিছু সময়। তারপর লে. জেনারেল নিয়াজী যখন আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের জন্য মাথা নত করলেন তখনই উপস্থিত আবেগাপ্লুত হাজার হাজার দর্শকের শ্লোগানে শ্লোগানে সারা রেসকোর্স ময়দান মুখরিত হয়ে ওঠে।